জীবতত্ত্ব

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদি যত রকমের প্রাণবিশিষ্ট বস্তু এই পরিদৃশ্যমান্ জগতে দৃষ্ট হয়, তাহাদের প্রত্যেকেরই দেহ আছে, জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই দেহটী থাকে চেতন; কিন্তু মৃত্যুর পরে তাহা হইয়া যায় অচেতন—তখন দেহের সমস্তই থাকে, থাকেনা কেবল চেতনা। তাহা হইতে বুঝা যায়—দেহের মধ্যে এমন একটা বস্তু ছিল, যাহার প্রভাবে সমস্ত দেহটাই চেতন এবং অনুভূতি-সম্পন্ন হইয়া থাকিত, মৃত্যুর সময়ে সেই বস্তুটা দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাতেই দেহটা অচেতন এবং অনুভূতিহীন হইয়া পড়িয়াছে। একটী অন্ধকার ঘরের মধ্যে যদি একটা প্রদীপ আনা যায়, ঘরের অন্ধকার দূর হইয়া যায়, ঘরটা আলোকিত হইয়া পড়ে; প্রদীপটী অন্যত্র লইয়া গেলে ঘরটা আবার অন্ধকার হইয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায়—প্রদীপটী আলোকময়, ইহা অপরকেও আলোকিত করিতে পারে। তদ্রূপ, যে বস্তুটী দেহে থাকিলে দেহটী চেতনাময় হয় এবং যাহা দেহ হইতে চলিয়া গেলে দেহ অচেতন হইয়া পড়ে, তাহা নিজেও চেতন এবং নিজের সংস্পর্শে দেহকেও চেতনাময় করিয়া তোলে। এই চেতন বস্তুকেই বলে জীব। যাহা নিজেও জীবিত এবং অপরকেও জীবিত করিতে পারে, তাহাই জীব। মনুষ্যাদি স্থাবর-জঙ্গমের দেহে যতক্ষণ এই জীব থাকে, ততক্ষণই তাহারা জীবিত (জীবযুক্ত) থাকে। তাহাদের দেহ হইল এই জীবের আশ্রয় বা আধার। দেহ কিন্তু জীব নয়; দেহের নিজের চেতনা নাই, জীবের চেতনা আছে। তথাপি, সাধারণতঃ জীববিশিষ্ট দেহকেও জীব বলা হয়। মানুষ একটী জীব, সিংহ একটী জীব, বৃক্ষ একটী জীব—এইরূপই সাধারণতঃ বলা হয়। পার্থক্য-সূচনার জন্য প্রকৃত-চেতনাময় জীবকে জীবস্বরূপ বা জীবাত্মা বলা হয়। জীবাত্মা হইল স্বরূপতঃই জীব; আর জীবাত্মাবিশিষ্ট দেহকে—মনুষ্যাদিকে—জীব বলা হয় কেবল উপচারবশতঃ। মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি নাম বা রূপ জীবাত্মার নহে। জীবাত্মা যখন মানুষের দেহে থাকে, তখন দেহসম্বলিত অবস্থায় মানুষ বলিয়া পরিচিত হয়; যখন পশুদেহে থাকে, তখন পশু বলিয়া কথিত হয়। একই জীবাত্মা কখনও মানুষ, কখনও পশু, কখনও তরু, গুল্ম, লতা ইত্যাদিও হইতে পারে।

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, তরু, লতা, গুল্মাদির দেহকে সকলেই দেখে; কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র জীব আছে—যেমন রোগের জীবাণু আদি—যাহাদিগকে খোলা চক্ষুতে দেখা যায় না, মাত্র অণুবীক্ষণযন্ত্রাদি দ্বারাই দেখা যায়। তথাপি, যন্ত্রাদির সাহায্যে হইলেও তাহারা চক্ষুদ্বারা দর্শনের যোগ্য। জীবাত্মাকে কিন্তু দেখা যায় না; যন্ত্রাদির সাহায্যেও জীবাত্মা অদৃশ্য। জীবাত্মার অস্তিত্ব বুঝা যায়—কেবল তাহার চেতনাময় প্রভাবের দ্বারা। যে সমস্ত জীব কেবলমাত্র অণুবীক্ষণযন্ত্রাদির সাহায্যেই দেখা যায়, তাহাদের মধ্যেও জীবাত্মা আছে; তাহা বুঝা যায়, তাহাদের জীবন-মৃত্যুদ্বারা।

মানুষের দেহের, পশুর দেহের, বা বৃক্ষাদির দেহের বৈশিষ্ট্যাদি বা উপাদানাদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা নির্ণয় করা যায়। কিন্তু জীবাত্মার উপাদান বা বৈশিষ্ট্যাদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা নির্ণয় করা যায় না। যাহাকে দেখা যায় না, ধরা-ছোঁয়া যায় না, তাহা কখনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বিষয়ীভূত হইতে পারে না। জীবাত্মা স্বরূপতঃ কি বস্তু, তাহার স্বরূপগত ধর্ম্মাদিই বা কিরূপ, তাহা কেবল শাস্ত্রোক্তি হইতেই জানা যায়। জীবাত্মার (অর্থাৎ স্বরূপতঃ জীবের) স্বরূপ-সম্বন্ধে শাস্ত্রসম্মত আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

জীব ভগবানের শক্তি। জীব হইল স্বরূপতঃ ভগবানের শক্তি। গীতা ও বিষ্ণুপুরাণে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা। অবিদ্যাকর্ম্ম-সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ ৬।৭।৬১॥—বিষ্ণুশক্তি (স্বরূপশক্তি) পরা-শক্তি নামে অভিহিতা; অপর একটী শক্তির নাম ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি (জীবশক্তি); অন্য একটী তৃতীয়া শক্তি অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞায় (বহিরঙ্গা মায়াশক্তি বলিয়া) অভিহিতা।"

গীতা বলেন—"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৭।৫ ॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—হে মহাবাহো, ইহা (পূর্ব্বশ্লোকে যে প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা জড় বলিয়া) নিকৃষ্টা প্রকৃতি; ইহা হইতে ভিন্না জীবশক্তিরূপা আমার একটী উৎকৃষ্টা (চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া উৎকৃষ্টা) প্রকৃতি আছে, তাহা তুমি জানিবে। এই উৎকৃষ্টা প্রকৃতিই (জীবশক্তির অংশরূপ জীবই স্ব-স্ব-কর্ম্মফল ভোগের জন্য বহিরঙ্গা-শক্তিভূত এই) জগৎকে ধারণ করিয়া আছে।" শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্। গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরমাণ ॥ ১।৭।১১২ ॥"

চিদ্রূপা শক্তি। দেখা গেল, জীব হইল ভগবানের জীবশক্তি। পূর্ব্বোদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণের "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা"-ইত্যাদি ৬।৭।৬১-শ্লোকে স্বরূপ-শক্তি ও মায়াশক্তির ন্যায় জীবশক্তিও যে একটী পৃথক শক্তি, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণবচনে তু তিসৃণামেব পৃথক্‌শক্তিত্বনির্দ্দেশাৎ"-ইত্যাদি। পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ২৫ ॥"

পূর্ব্বোদ্ধৃত "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাম্" ইত্যাদি গীতোক্ত (৭।৫) শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে জীবশক্তিকে উৎকৃষ্ট বলার হেতু এই যে, মায়াশক্তি হইল জড়, কিন্তু জীবশক্তি হইল চৈতন্যময়ী। "ইয়ং প্রকৃতির্বহিরঙ্গা শক্তিঃ, অপরা অনুৎকৃষ্টা জড়ত্বাৎ। ইতোঽন্যাং প্রকৃতিং তটস্থাং শক্তিং জীবভূতাং পরমুৎকৃষ্টাং বিদ্ধি চৈতন্যত্বাৎ ॥" উক্ত শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদের অর্থও এইরূপ এবং শ্রীপাদশঙ্করাচার্য্যের অর্থের মর্ম্মও এইরূপই। ইহা হইতে জানা গেল—জীবশক্তি চৈতন্যময়ী, চিদ্রূপা। পরমাত্মসন্দর্ভও তাহাই বলেন। "জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। ন জড়ো ন বিকারী। ১৯ ॥" "দৈবাৎক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরং পুমান্। আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥ শ্রীভা, ৩।২৬।১৯ ॥" —এই শ্লোকের টীকায় বীর্য্যং-শব্দের অর্থে শ্রীপাদবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন "জীবশক্ত্যাখ্যং চৈতন্যম্", শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"জীবাখ্যচিদ্রূপশক্তিম্" এবং শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"চিচ্ছক্তিম্।" ইহা হইতে জানা যাইতেছে—জীবশক্তি চৈতন্যস্বরূপ, চিদ্রূপা শক্তি; সময় সময় ইহাকে চিচ্ছক্তিও বলা হয়। কিন্তু এই চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তিরূপা চিচ্ছক্তি নয়।

তটস্থাশক্তি। এই জীবশক্তি স্বরূপ-শক্তির অন্তর্ভুক্তও নহে, মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্তও নহে। "ন বিদ্যতে বহির্বহিরঙ্গামায়াশক্ত্যা অন্তরেণান্তরঙ্গ-চিচ্ছক্ত্যা চ সম্যগ্ বরণং সর্ব্বথা স্বীয়ত্বেন স্বীকারো যস্য তম্ —শ্রীভা, ১০।৮৭।২০ শ্লোক-টীকায় অবহিরন্তরসম্বরণম্-শব্দের অর্থে চক্রবর্ত্তিপাদ।" এইরূপে, বহিরঙ্গা মায়াশক্তির মধ্যে এবং অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির মধ্যেও স্বীয়ত্বরূপে স্বীকৃত নহে বলিয়া, অর্থাৎ এই জীবশক্তি—স্বরূপশক্তিও নহে, মায়াশক্তিও নহে, পৃথক্ একটী শক্তি বলিয়া, ইহাকে তটস্থা শক্তিও বলে। "অথ তটস্থত্বঞ্চ * * * উভয়কোটাবপ্রবিষ্টত্বাদেব। পরমাত্ম-সন্দর্ভঃ। ৩৯॥" এই চিদ্রূপা জীবশক্তিকে শ্রীনারদপঞ্চরাত্রও তটস্থশক্তি বলিয়াছেন। "যত্তটস্থং তু চিদ্রূপং স্বসংবেদ্যাদ্বিনির্গতম্। রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে ॥ পরমাত্ম-সন্দর্ভ (২৬) ধৃতবচনম্।"

উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা গেল, জীবশক্তি চিদ্রূপা শক্তি হইলেও ইহা ভগবানের স্বরূপশক্তি-রূপা চিচ্ছক্তি নহে। সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের চিদংশের শক্তির নামই স্বরূপশক্তি-রূপা চিচ্ছক্তি। চিদ্রূপা জীবশক্তি হইল জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশ, স্বরূপশক্তি-বিশিষ্টকৃষ্ণের অংশ নহে। (পরবর্ত্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য)। জীবশক্তি জড় নহে, পরন্তু চৈতন্যময়ী—ইহা বুঝাইবার জন্যই ইহাকে চিদ্রূপা বলা হয়। ভগবৎস্বরূপে এই শক্তির স্থিতি নাই বলিয়া ইহা স্বরূপশক্তিরূপা চিচ্ছক্তি নহে।

জীব ভগবানের অংশ। জীব ভগবানের অংশ; গীতায় অর্জ্জুনের নিকট শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাহা বলিয়াছেন। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। ১৫।৭॥"

বেদান্তমতেও জীব ব্রহ্মেরই অংশ। "অংশো নানাব্যপদেশাৎ অন্যথা চ অপি দাশকিতবাদিত্বম্ অধীয়ত একে ২।৩।৪৩॥"—এইসূত্রে জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে। অংশঃ (পরমেশ্বরের অংশ জীব; অংশু—কিরণ—যেমন

সূর্য্যের অংশ এবং সূর্য্যের সহিত সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে, তদ্রূপ জীব ঈশ্বরের অংশ এবং ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে। কেন জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলা হইল ?) নানাব্যপদেশাৎ (ঈশ্বরের সহিত জীবের নানারূপ সম্বন্ধের উল্লেখ আছে বলিয়া। যেমন সুবালশ্রুতি বলেন—দিব্যো দেব একো নারায়ণো মাতা পিতা ভ্রাতা নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্গতির্নারায়ণ ইতি—এক নারায়ণ মাতা, পিতা, ভ্রাতা, নিবাস, শরণ, সুহৃদ্ গতি। স্মৃতিশাস্ত্রও বলেন—গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্ ইত্যাদি।—ঈশ্বরই জীবের গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ এবং সুহৃদ্। এইরূপে দেখা যায়, স্মৃতি-শ্রুতিতে জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের নানাবিধ সম্বন্ধের উল্লেখ আছে। তাহাতেই জীব যে ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে, তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জীব নিয়ন্ত্রিত ; ব্রহ্ম আধার, জীব আধেয় ; ব্রহ্ম প্রভু, জীব দাস—ইত্যাদি নানাবিধ সম্বন্ধের উল্লেখ স্মৃতি-শ্রুতিতে পাওয়া যায়)। অন্যথা চ অপি (অন্যরূপও উল্লেখ আছে। পূর্ব্বোল্লিখিত নানাবিধ সম্বন্ধের উল্লেখে ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদ সূচিত হইয়াছে। অন্যরূপ—অর্থাৎ অভেদের উল্লেখও দৃষ্ট হয়। কোথায় অভেদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় ?) দাসকিতবাদিত্বম্ অধীয়ত একে (কেহ কেহ—আথর্ব্বণিকেরা—বলেন, ব্রহ্মই দাস-কিতবাদিরূপ জীব। ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমে কিতবা ইতি।—কৈবর্ত্ত, ভৃত্য, কপটী—এসকল জীব ব্রহ্মই—ইহাই তাঁহাদের উক্তি। কিন্তু জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপে অভিন্ন হইলে এইরূপ ব্যপদেশ সম্ভব নয়। যেহেতু, কেহ কখনও নিজের ব্যাপ্য হইতে পারেনা, সৃজ্যও হইতে পারে না। আবার চৈতন্যঘন ব্রহ্ম বস্তুর স্বরূপতঃ দাসাদিভাবও সম্ভব নয়)। (গোবিন্দভাষ্য)। ভাষ্যকার শেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—জীব ব্রহ্মের শক্তি বলিয়াই ব্রহ্মের অংশ।

শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে যখন ভেদের উল্লেখও দেখা যায়, অভেদের উল্লেখও দেখা যায়, তখন বুঝিতে হইবে—জীব ব্রহ্মের অংশ। যেহেতু, অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদও আছে, অভেদও আছে।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও—তাঁহার ভাষ্যের উপসংহারে বলিয়াছেন—অতো ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ। —শ্রুতির উক্তি অনুসারে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ এবং অভেদ উভয়ই অবগত হওয়া যায় বলিয়া জীব-ব্রহ্মের অংশাংশিভাবই প্রতীত হয়।

পরবর্ত্তী "মন্ত্রবর্ণাৎ চ॥২।৩।৪৪॥"-সূত্রেও বলা হইয়াছে, বেদের মন্ত্রাংশ হইতেও জানা যায় যে, জীব ব্রহ্মের অংশ। পুরুষসূক্তে আছে—"পাদোঽস্য সর্ব্বভূতানি—সর্ব্বভূত ব্রহ্মের একটি অংশ। এস্থলে সর্ব্বভূত-শব্দে চরাচর বিশ্বকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, যাহার মধ্যে জীবই প্রধান। (শঙ্করভাষ্য)।

শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ (গোবিন্দভাষ্য) বলেন, উক্ত মন্ত্রে "ভূতানি" শব্দে জীবাত্মা যে বহুসংখ্যক, তাহাই সূচিত হইতেছে।

পরবর্ত্তী "অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ২।৩।৪৫ ॥"—সূত্রে বলা হইয়াছে, স্মৃতি হইতেও জানা যায়, জীব ব্রহ্মের অংশ। ইহার প্রমাণরূপে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যাদি ভাষ্যকারগণ "মমৈবাংশো জীবলোকে"—ইত্যাদি গীতাশ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, জীব যদি ব্রহ্মের অংশ হয়, তবে জীবের (মায়াবদ্ধজীবের) দুঃখ হইলে ব্রহ্মেরও দুঃখ হইবে—যেমন কোনও ব্যক্তির দেহের অংশ হস্তপদাদি আহত হইলে সেই ব্যক্তির কষ্ট হয়, তদ্রূপ। পরবর্ত্তী সূত্রে ব্যাসদেব তাহার উত্তর দিয়াছেন।

"প্রকাশাদিবৎ ন এবং পরঃ ॥২।৩।৪৬ ॥"—"ন এবং পরঃ"—জীব যেমন দুঃখী হয়, পর বা ব্রহ্ম সেরূপ হন না। "প্রকাশাদিবৎ"—সূর্য্যের ন্যায়। সূর্য্যের আলোতে অঙ্গুলি ধরিয়া সেই অঙ্গুলি বাঁকাইলে সূর্য্যের আলোও বাঁকাইয়াছে বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু সেই বক্রতা সূর্য্যকে স্পর্শ করে না। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। (মায়াবদ্ধ) জীব দেহাত্মবুদ্ধি পোষণ করে বলিয়া দেহের দুঃখকে নিজের দুঃখ মনে করিয়া দুঃখী হয়। (শঙ্করভাষ্য)।

পরবর্ত্তী "স্মরতি চ ॥২।৩।৪৭ ॥"—সূত্রেও বলা হইয়াছে, স্মৃতিতেও ব্রহ্মের নির্লিপ্ততার কথা বলা হইয়াছে। "ন লিপ্যতে কর্ম্মফলৈঃ পদ্মপত্র মিবাম্ভসা।—পদ্মপত্র যেমন জলের দ্বারা লিপ্ত হয় না, "মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায়" ব্রহ্মও তদ্রূপ কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না। শ্রুতিও তাহা বলেন—"তয়োঃ অন্যঃ পিপ্পলং স্বাদু অত্তি অনশ্নন্ অন্যঃ অভিচাকশীতি। —ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে একজন (জীব) পক কর্ম্মফল ভক্ষন করে; অপর জন (ব্রহ্ম) ভক্ষণ করেন না, কেবল দর্শন করেন। (শঙ্করভাষ্য)।

এসকল বেদান্তসূত্রে জীবের ব্রহ্মাংশত্ব প্রতিপন্ন হইল।

কিরূপ অংশ। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, জীব (জীবাত্মা) ব্রহ্মের কিরূপ অংশ?

শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ বেদান্তের গোবিন্দভাষ্যে এবিষয় আলোচনা করিয়াছেন। "অংশো নানাব্যপদেশাৎ"—ইত্যাদি ২।৩।৪৩-সূত্রের ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন—"ন চেশস্য মায়য়া পরিচ্ছেদঃ তস্য তদবিষয়ত্বাৎ—জীব মায়াদ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের কোনও অংশ হইতে পারে না; যেহেতু, ব্রহ্ম মায়ার বিষয়ীভূত নয়; মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শই করিতে পারে না, ছেদ করিবে কিরূপে?" তারপর বলিয়াছেন—"ন চ টঙ্কচ্ছিন্নপাষাণখণ্ডবৎ তচ্ছিন্নস্তৎখণ্ডো জীবঃ অচ্ছেদ্যত্বশাস্ত্রব্যাকোপাৎ বিকারাদ্যাপত্তেশ্চ—টঙ্কচ্ছিন্ন পাষাণখণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মের কোনও এক বিচ্ছিন্ন অংশই জীব, একথাও বলা চলেনা (পাষাণকে খণ্ড করিবার যন্ত্রকে টঙ্ক বলে); যেহেতু, শাস্ত্র বলেন—ব্রহ্ম অচ্ছেদ্য; বিশেষতঃ, ব্রহ্মকে এই ভাবে ছেদ করা যায় মনে করিলে ব্রহ্মের বিকারিত্ব-দোষও স্বীকার করিতে হয়; শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্ম কিন্তু বিকারহীন।" শেষকালে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"তত্ত্বঞ্চ তস্য তচ্ছক্তিত্বাৎ সিদ্ধম্—ব্রহ্মের শক্তি বলিয়াই জীব ব্রহ্মের অংশ, ইহাই তত্ত্ব।" শক্তি হইলে কিরূপে অংশ হইতে পারে, তাহাও ভাষ্যকার বিচার করিয়াছেন। "একবস্ত্বেকদেশত্বমংশত্বমিতি অপি ন তদতিক্রামতি। ব্রহ্ম খলু শক্তিমদেকং বস্তু ব্রহ্মশক্তির্জীবো ব্রহ্মৈকদেশত্বাৎ ব্রহ্মাংশো ভবতি।—কোনও বস্তুর একদেশই হইল সেই বস্তুর অংশ; ব্রহ্মের শক্তি জীবও ব্রহ্মের একদেশ; যেহেতু ব্রহ্ম হইল শক্তিমান্ একবস্তু—ব্রহ্মের শক্তি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে।"

উক্ত সিদ্ধান্ত শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর সিদ্ধান্তেরই অনুগত। শ্রীমদ্ভাগবতের "স্বকৃতপুরেষ্বমীষ্বহিরন্তরসংবরণং তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোহংশকৃতম্। ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং ভবত উপাসতেহঙ্ঘ্রিমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ॥ ১০।৮৭।২০॥"-এই শ্লোকের প্রমান উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে শ্রীজীব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"তত্র শক্তিরূপত্বেনৈবাংশত্বং ব্যঞ্জয়তি—শক্তিরূপেই জীব ব্রহ্মের অংশ। ৩১॥"

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতেছে এই যে—জীব কি ব্রহ্মের কেবল শক্তিরূপেই অংশ? অর্থাৎ জীবে কি ব্রহ্মের কেবল শক্তিমাত্রই আছে, না শক্তিমান্‌সহ শক্তি আছে? পূর্ব্বোদ্ধৃত গোবিন্দ-ভাষ্যে দৃষ্ট হয়, "ব্রহ্ম খলু শক্তি-মদেকং বস্তু—ব্রহ্ম হইলেন শক্তিমান্ একটী মাত্র বস্তু।" একটী মাত্র বস্তু বলার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের শক্তিকে পৃথক্ করা যায় না। "মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥" ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের শক্তি, মৃগমদ এবং তার গন্ধের ন্যায়, অবিচ্ছেদ্য। ইহা হইতে বুঝা যায়—শক্তিযুক্ত ব্রহ্মেরই (অথবা শক্তিমানের সহিত সংযুক্ত শক্তিই) হইল জীব।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন জাগে—কোন্ শক্তির সহিত সংযুক্ত ব্রহ্মের অংশ হইল জীব? ব্রহ্মের সহিত তাঁহার সকল শক্তির যোগ একরকম নহে। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ব্রহ্ম হইতে অবিচ্ছিন্না হইলেও, তাহার সহিত ব্রহ্মের সংযোগ স্বরূপ-শক্তির মত নহে। স্বরূপ-শক্তি থাকে ব্রহ্মেরই স্বরূপের মধ্যে। মায়াশক্তির সহিত ব্রহ্মের কিন্তু স্পর্শ নাই; তথাপি, ব্রহ্ম মায়াশক্তির নিয়ন্তা, মায়াশক্তি ব্রহ্মকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত, ব্রহ্মের উপরেই মায়াশক্তির সত্তা নির্ভর করে, ব্রহ্মের ব্যাতিরেকে মায়ারও ব্যাতিরেক হয় বলিয়া (ঋতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্-বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ। শ্রীভা, ২।৯।৩৩॥) মায়াশক্তিও ব্রহ্মের সহিত অবিচ্ছেদ্য-ভাবে সংযুক্তা। অন্যান্য শক্তিসম্বন্ধেও এইরূপ।

যাহা হউক, মায়াশক্তির সহিত সংযুক্ত ব্রহ্মই কি জীব? তাহা নয়। যেহেতু, "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ গীতা। ৭।৫॥"-এই শ্রীকৃষ্ণোক্তিতে জীবশক্তিকে মায়াশক্তি হইতে ভিন্না এবং উৎকৃষ্টা বলা হইয়াছে; উৎকৃষ্টা বলার হেতু এই যে, মায়াশক্তি জড়, কিন্তু জীবশক্তি চেতনাময়ী। জীব (বা জীবশক্তি) যদি মায়াশক্তিযুক্ত ব্রহ্মেরই অংশ হইত, তাহা হইলে, ইহাকে মায়াশক্তি অপেক্ষা ভিন্না বা উৎকৃষ্টা বলা হইত না।

তবে কি স্বরূপশক্তিযুক্ত ব্রহ্মের অংশই জীব? শ্রীপাদবলদেব বিদ্যাভূষণ "অংশো নানাব্যপদেশাৎ"-ইত্যাদি ২।৩।৪৩-বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে এবিষয়ে বিচার করিয়াছেন। জীব যদি স্বরূপশক্তিযুক্ত ব্রহ্মেরই অংশ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মে ও জীবে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ থাকে না। অথচ জীব সৃজ্য, ব্রহ্ম স্রষ্টা; জীব নিয়ম্য, ব্রহ্ম তাহার নিয়ন্তা; জীব ব্যাপ্য, ব্রহ্ম তাহার ব্যাপক—ইত্যাদি সম্বন্ধ শ্রুতিস্মৃতি-প্রসিদ্ধ। জীব এবং ব্রহ্ম যদি স্বরূপতঃ অভিন্নই হয়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে উক্তরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। নিজে কেহ নিজের স্রষ্টা বা সৃজ্য, কিম্বা ব্যাপক বা ব্যাপ্য হইতে পারে না। "ন হি স্বয়ং স্বস্য সৃজ্যাদির্ব্যাপ্যো বা। গোবিন্দভাষ্য।" সুতরাং জীব স্বরূপ-শক্তিযুক্ত ব্রহ্মের (বা স্বরূপশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের) অংশ হইতে পারে না। ইহাও শ্রীপাদজীব-গোস্বামীর সিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্বনি। তাহাই দেখান হইতেছে।

দেখা গিয়াছে—জীব (বা জীবাত্মা) হইল শক্তিযুক্ত ব্রহ্মের (শ্রীকৃষ্ণের) অংশ। আরও দেখা গিয়াছে—জীব মায়াশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশ নয়, স্বরূপশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের (বা ব্রহ্মের) অংশও নয়। বাকী রহিল এক জীবশক্তি। তাহা হইলে জীব (বা জীবাত্মা) কি জীবশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের (বা ব্রহ্মের) অংশ? পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের "স্বকৃতপুরেম্বমীম্ববহিরন্তরসংবরণম্" ইত্যাদি (১০।৮৭।২০)-শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে (৩১) বলিয়াছেন—"অংশকৃতমংশমিত্যর্থঃ অখিলশক্তিধৃতঃ সর্ব্বশক্তিধরস্যেতি বিশেষণং জীবশক্তিবিশিষ্টস্যৈব তব জীবোঽংশঃ ন তু শুদ্ধস্যেতি।" এই প্রমাণ হইতে জানা যায়, শ্রুতিগণ বলিতেছেন (উক্ত শ্লোকটী শ্রুতিগণের শ্রীকৃষ্ণস্তুতির অন্তর্ভুক্ত)—জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশই জীব, শুদ্ধকৃষ্ণের অংশ নহে। এস্থলে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ-বলে শ্রীজীবগোস্বামী সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, জীবশক্তি-বিশিষ্ট কৃষ্ণের (বা ব্রহ্মের) অংশই জীব বা জীবাত্মা।

কিন্তু জীব শুদ্ধ-কৃষ্ণের অংশ নয়—একথার তাৎপর্য্য কি? শুদ্ধ-কৃষ্ণ কাহাকে বলে? উল্লিখিত শ্রীমদ্-ভাগবতের শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় শ্রীপাদসনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"তদেবমন্তর্য্যামিত্বাংশেঽপি ভগবতঃ শুদ্ধত্ববর্ণনেন তৎপরাণাং শ্রুতীনাং বচনং শ্রুত্বা"-ইত্যাদি। ইহা হইতে জানা গেল—অন্তর্য্যামিত্বাংশেই ভগবানের (বা ব্রহ্মের) শুদ্ধত্ব। স্বরূপশক্তি-সমন্বিত ব্রহ্ম বা কৃষ্ণই অন্তর্য্যামী। সুতরাং স্বরূপশক্তি-সমন্বিত কৃষ্ণই শুদ্ধ-কৃষ্ণ—ইহাই পাওয়া গেল। এবং ইহা হইতে ইহাও জানা গেল যে, জীব স্বরূপশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশ নহে; সুতরাং জীবে স্বরূপশক্তিও থাকিতে পারে না। জীবে যে স্বরূপশক্তি নাই, বিষ্ণুপুরাণও তাহা বলিয়াছেন। "হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥ বি, পু, ১।১২।৬৯॥" শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ১।৪।৭ শ্লোকের টীকায় এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন হইতে পারে, স্বরূপশক্তিই ব্রহ্মের বা ভগবানের স্বরূপে অবস্থিত থাকে; জীবশক্তি ভগবানের স্বরূপে অবস্থিত থাকে না। এই অবস্থায় ভগবান্ কিরূপে জীবশক্তির সহিত যুক্ত হইতে পারেন? পরমাত্মসন্দর্ভে ইহার সমাধান পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের "পরস্পরানুপ্রবেশাৎ তত্ত্বানাং পুরুষর্ষভ। পৌর্ব্বাপর্য্যপ্রসংখ্যানং যথা বক্তুর্বিবক্ষিতম্॥"-এই ১১।২২।৭-শ্লোকের প্রমাণে শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"সর্ব্বেষামেব তত্ত্বানাং পরস্পরানু-প্রবেশবিবক্ষয়ৈক্যং প্রতীয়ত ইত্যেবং শক্তিমতি পরমাত্মনি জীবাখ্যশক্ত্যনুপ্রবেশবিবক্ষয়ৈব তয়োরৈক্যপক্ষে হেতু-রিত্যভিপ্রেতি। পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৩৪॥" এই উক্তি হইতে জানা যায়—শক্তিমান্ পরমাত্মাতে (ভগবানে) জীবশক্তি অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। এই অনুপ্রবেশবশতঃই ভগবান্ জীবশক্তিযুক্ত হইয়াছেন।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—ভগবান্-পরমাত্মার স্বরূপেই তো স্বরূপশক্তি নিত্য বর্ত্তমান। সেই ভগবানে যখন জীবশক্তি অনুপ্রবেশ করিল, তখন এই জীবশক্তিবিশিষ্ট ভগবানেও তো স্বরূপশক্তি থাকিবে—যেহেতু, স্বরূপশক্তি হইল ভগবানের স্বরূপে অবিচ্ছেদ্যরূপে বিরাজিত। তাহা হইলে জীবেই বা স্বরূপশক্তি থাকিবে না কেন? মিশ্রীর সরবত সর্ব্বদাই মিষ্ট; তাহাতে যদি লেবুর রস মিশ্রিত হয়, সরবতের মিষ্টত্ব তো লোপ পাইয়া যায় না।

ইহার উত্তরে এই মাত্র বলা যায়—ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিতে ইহা অসম্ভব নয়। প্রাকৃত জগতেও এইরূপ দেখা যায়। কোনও বিচারপতি তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে কোমলচিত্ত এবং খুব দয়ালু হইতে পারেন; কিন্তু যখন তিনি বিচারাসনে বসেন, তখন আইনানুগত ন্যায়পরায়ণতা তাঁহাকে আশ্রয় করে; তখন তিনি প্রাণদণ্ডের আদেশও দিতে পারেন। তখন তাঁহার চিত্তের কোমলতা এবং দয়ালুতা যেন নিদ্রিত থাকে, ন্যায়পরায়ণতাই তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিয়া রাখে। এস্থলে বলা যায়—ন্যায়পরায়ণতা তাঁহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার অসাধারণ শক্তি থাকিলে ন্যায়পরায়ণতার ভিতর দিয়া তাঁহার কোমলচিত্ততা এবং দয়ালুতা উঁকি-ঝুকিও মারিবে না। ভগবানের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। জীবশক্তি যখন তাঁহাতে অনুপ্রবেশ করে, তখন তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে তাঁহার স্বরূপশক্তি কিঞ্চিন্মাত্রই বিকশিত হয় না, একমাত্র জীবশক্তিই তাঁহাতে প্রকাশ লাভ করিয়া থাকে। স্বরূপশক্তি ঈশ্বরে নিত্য অবস্থিত থাকিয়াও যে বিকাশপ্রাপ্ত হয় না, তাঁহার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপই তাহার প্রমাণ। স্বরূপশক্তির বিকাশহীন ব্রহ্মে অনুপ্রবিষ্ট জীবশক্তি অনাদিকাল হইতেই নিত্য-বিরাজিত; এই তত্ত্বকেই শ্রীজীবগোস্বামী জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণ বলিয়াছেন এবং এই জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশই জীব বা জীবাত্মা।

সুতরাং জীব বা জীবাত্মা কেবল শক্তিমাত্রেরই অংশ নয়, জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণেরই অংশ।

বিভিন্নাংশ। ভগবানের অংশ দুই রকমের—স্বাংশ এবং বিভিন্নাংশ। "তত্র দ্বিবিধা অংশাঃ স্বাংশা বিভিন্নাংশাশ্চ। বিভিন্নাংশাস্তটস্থশক্ত্যাত্মকা জীবা ইতি বক্ষ্যতে। স্বাংশাস্তু গুণলীলাদ্যবতারভেদেন বিবিধাঃ। পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৪৫॥" লীলাবতার-গুণাবতারাদি বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ হইল ভগবানের স্বাংশ; আর জীব হইল বিভিন্নাংশ। "অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্। স্বরূপ-শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান॥ স্বাংশ-বিভিন্নাংশরূপে হইয়া বিস্তার। অনন্ত বৈকুণ্ঠব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার॥ স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্যূহ অবতারগণ। বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গণন॥ ২।২২।৫-৭॥"

এসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের "স্বকৃতপুরেষমীষ্বহিরন্তরসংবরণম্" ইত্যাদি ১০।৮৭।২০-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"মণ্ডলস্থানীয়স্য ভগবত এব স্বল্পশক্তিব্যক্তিময়াবির্ভাববিশেষত্বাৎ স্বাংশত্বং শ্রীমৎস্যদেবাদীনাং রশ্মিস্থানীয়ত্বাৎ বিভিন্নাংশত্বং জীবানামিতি তত্ত্ববাদিনঃ। অত্র তদুদাহৃতং মহাবারাহ-বচনঞ্চ। স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ ইষ্যতে। অংশিনো যত্তু সামর্থ্যং যৎস্বরূপং যথাস্থিতিঃ॥ তদেব নাণুমাত্রোপি ভেদঃ স্বাংশাংশিনোঃ ক্বচিৎ। বিভিন্নাংশোঽল্পশক্তিঃ স্যাৎ কিঞ্চিৎ সামর্থ্যমাত্রযুক্॥" তাৎপর্য্য—"একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা। পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তি স্তথেদমখিলং জগৎ॥ ১।২২।৫৪॥"—এই বিষ্ণুপুরাণ-শ্লোক অনুসারে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সূর্য্যমণ্ডলতুল্য এবং পরিদৃশ্যমান্ জগৎকে—সুতরাং জীবকেও—তাহার রশ্মিতুল্য মনে করা যায়। রশ্মি থাকে সূর্য্যমণ্ডলের বাহিরে—যদিও তাহা সূর্য্যেরই অংশ। সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে রশ্মি থাকে না। তদ্রূপ জীব ঈশ্বরের অংশ হইলেও ঈশ্বরের স্বরূপের মধ্যে থাকেনা, বাহিরে থাকে। পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপগণের পৃথক্ পৃথক্ বিগ্রহ নাই; তাঁহারা স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই বিগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। শক্তিতেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ন্যূন; তাই শ্রীকৃষ্ণ হইলেন অংশী, আর অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপের প্রত্যেকেই হইলেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ। তাঁহারা হইলেন সূর্য্যমণ্ডলস্থানীয় শ্রীকৃষ্ণেরই অল্পশক্তিব্যক্তিময় আবির্ভাববিশেষ এবং তাঁহারা মণ্ডলের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহাদের মধ্যে এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে স্বরূপতঃ কোনও

পার্থক্য নাই। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া তাঁহারা স্বরূপ-শক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণেরই অংশ ; এজন্য এসমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ সমূহকে বলা হয় শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ। ইঁহাদের মধ্যে স্বরূপ-শক্তি আছে। আর, রশ্মিস্থানীয় জীব হইল শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ। বিভিন্নাংশ জীব অল্পশক্তি, সামান্য-সামর্থ্যযুক্ত। স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশকে বলে স্বাংশ—চতুর্ব্যূহ, পরব্যোমস্থ অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ, পুরুষত্রয়, লীলাবতার, গুণাবতারাদি। আর জীবশক্তি-বিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশকে বলে বিভিন্নাংশ, বিভিন্নাংশে স্বরূপশক্তি নাই। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ পরিকর-গণও স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া তাঁহারা স্বাংশের অন্তর্ভুক্ত।

সূর্য্যরশ্মি যেমন সর্ব্বদাই সূর্য্যের বাহিরেই থাকে, তদ্রূপ জীবও সর্ব্বদা কৃষ্ণস্বরূপের বাহিরেই থাকে। সূর্য্যরশ্মি যেমন কখনও সূর্য্যমণ্ডলের অন্তর্ভূত হইয়া যায় না, জীবও তদ্রূপ কখনও কৃষ্ণস্বরূপের অন্তর্ভূত হইয়া যায় না—মুক্তাবস্থাতেও না। এজন্যই বোধ হয় জীবকে বিভিন্নাংশ—বিশেষরূপে ভিন্ন অংশ বলা হইয়াছে।

জীবের পরিমাণ বা আয়তন। জীব বা জীবাত্মা পরিমাণে কি বিভু (সর্ব্বব্যাপক), না মধ্যমাকার, না কি অতিক্ষুদ্র বা অণুপরিমাণ?

জীবাত্মা যদি বিভু বা সর্ব্বব্যাপক হয়, তাহা হইলে তাহার একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত সম্ভব হয় না; কোনও আধারে আবদ্ধ হওয়া বা সেই আধার হইতে বাহির হইয়া যাওয়াও সম্ভব হয় না। কিন্তু কৌষিতকী শ্রুতি বলেন—জীবাত্মা (জগতিস্থ স্থাবর-জঙ্গমাদি প্রাণীর) দেহ হইতে বাহির হইয়া গমন করে। "স যদা অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি সহ এব এতৈঃ সর্ব্বৈঃ উৎক্রামতি।—জীবাত্মা যখন শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়, তখন বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সকলের সহিতই বাহির হইয়া যায়। ৩।৩॥" জীবাত্মা যে একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করে, তাহাও কৌষিতকী শ্রুতি হইতে জানা যায়। "যে বৈ কে চ অস্মাৎ লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি।—যাহারা এই পৃথিবী হইতে গমন করে, তাহারা সকলে চন্দ্রলোকেই গমন করে। ১।২।" আগমন করার কথাও বৃহদারণ্যক-শ্রুতি হইতে জানা যায়। "তস্মাল্লোকাৎ পুনরেতি অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে। ৪।৪।৬॥—কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত সেইলোক (পরলোক) হইতে আবার এই পৃথিবীতে আসে।" এসকল কথাই "উৎক্রান্তিগত্যা-গতীনাম্।"—এই ২।৩।১৯-বেদান্তসূত্রে বলা হইয়াছে। এই সূত্রের ভাষ্যারম্ভে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"ইদানীন্তু কিম্পরিমাণো জীব ইতি চিন্ত্যতে। কিমণুপরিমাণ উত মধ্যমপরিমাণ আহোস্বিন্মহৎপরিমাণ ইতি।—জীবের (জীবাত্মার) পরিমাণ কি অণু? না কি মধ্যম? না কি মহৎ—বিভু? তাহারই বিচার করা হইতেছে।" তারপরে তিনি বলিয়াছেন—"উৎক্রান্তিগত্যাগতিশ্রবণানি জীবস্য পরিচ্ছেদং প্রাপয়ন্তি।—জীবের উৎক্রমণ, গমন এবং আগমনের কথা শুনা যায় বলিয়া জীব (বিভু হইতে পারে না,) পরিচ্ছিন্নই হইবে।" শ্রীপাদ বলদেব-বিদ্যাভূষণও তাঁহার গোবিন্দভাষ্যে উক্তরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। যাহা হউক, জীবাত্মা যে বিভু নহে, তাহাই শ্রুতি-বেদান্ত হইতে জানা গেল। জীবাত্মা অপরিচ্ছিন্ন নহে, পরিচ্ছিন্ন।

যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহা মধ্যমাকারও হইতে পারে, অণুপরিমাণও হইতে পারে। তবে কি জীব মধ্যমাকার? মধ্যমাকার বলিতে দেহের যেই আকার, জীবাত্মারও সেই আকার বুঝায়। জৈনদের মতে জীবাত্মা মধ্যমাকার। বেদান্তের "এবং চ আত্মা অকার্ৎস্ন্যম্॥"—এই ২।২।৩৪-সূত্রে এই জৈনমতের খণ্ডন করা হইয়াছে। এই সূত্রের মর্ম্ম শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যানুসারে এইরূপ। একই জীবাত্মা কর্ম্মফল অনুসারে কখনও মনুষ্যদেহ, কখনও কীটদেহ, কখনও বা হস্তিদেহকে আশ্রয় করে। যে জীব কীটের ক্ষুদ্র দেহমাত্র ব্যাপিয়া থাকে, তাহাই আবার হস্তীর বৃহৎ দেহকে কিরূপে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে? ভিন্ন দেহের কথা ছাড়িয়া দিলেও একদেহেরও বিভিন্ন পরিমাণ দৃষ্ট হয়। শৈশব, কুমার, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য—জীবনের এসমস্ত বিভিন্ন অবস্থায় দেহের পরিমাণও বিভিন্ন হইয়া থাকে। আত্মা যদি মধ্যমাকার বা দেহপরিমিত আকারবিশিষ্টই হয়, তাহা হইলে একই জীবাত্মার পরিমাণ কিরূপে বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন হইবে? যদি বল—দেহের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে জীবাত্মার পরিমাণও হ্রাস-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহারই উত্তর পাওয়া যায়, বেদান্তের পরবর্ত্তী সূত্রে—"ন চ পর্য্যায়াদ্ অপি অবিরোধঃ

বিকারাদিভ্যঃ ॥ ২।২।৩৫ ॥-সূত্রে।" এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই। যদি বলা যায়, জীবাত্মা পর্য্যায়ক্রমে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত বিরোধের নিরসন হয় না। "বিকারাদিভ্যঃ"—কারণ, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, জীবাত্মা বিকারী—সুতরাং অনিত্য। সুতরাং দেহের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে আত্মারও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, এই মত শ্রদ্ধেয় নহে। আরও যুক্তি আছে। তাহা পরবর্ত্তী বেদান্তসূত্রে—"অন্ত্যাবস্থিতেঃ চ উভয়নিত্যত্বাৎ অবিশেষঃ ॥ ২।২।৩৬ ॥"-সূত্রে দেখান হইয়াছে। উভয়নিত্যত্বাৎ—আত্মা এবং তাহার পরিমাণ এতদুভয়ই নিত্য বলিয়া, অন্ত্যাবস্থিতেঃ—মোক্ষাবস্থায় অবস্থিত জীবাত্মার, অবিশেষঃ—বিশেষত্ব (পরিমাণ-বিষয়ে বিশেষত্ব) কিছু নাই। আত্মা যেমন নিত্য, তাহার পরিমাণও নিত্য—সকল সময়েই একই আকার বিশিষ্ট অর্থাৎ কখনও বড় বা কখনও ছোট হইতে পারে না। মোক্ষপ্রাপ্তির পরে যে আকার থাকিবে, মোক্ষপ্রাপ্তির পূর্ব্বে দেহে অবস্থানকালেও সেই পরিমাণই থাকিবে। সুতরাং জীবাত্মা মধ্যমাকার হইতে পারে না; যেহেতু, মধ্যমাকার হইলেই দেহ-অনুসারে জীবাত্মাকে কখনও বড়, কখনও ছোট হইতে হয়।

এইরূপে দেখা গেল, জীব বিভুও নয়, মধ্যমাকারও নয়। তবে কি জীবাত্মা অণুপরিমাণ?

শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"ঈশ্বরের তত্ত্ব—যেন জ্বলিত জ্বলন। জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥ ১।৭।১১১ ॥" ঈশ্বর বহুবিস্তীর্ণ জ্বলন্ত অগ্নিরাশির তুল্য, আর জীব ক্ষুদ্র একটী স্ফুলিঙ্গের তুল্য ক্ষুদ্র।

শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ ॥ ১১।১৬।১১ ॥—সূক্ষ্মবস্তুসমূহের মধ্যে আমি জীব।" জীবাত্মা এত ক্ষুদ্র যে, তদপেক্ষা অধিকতর ক্ষুদ্র বস্তুর আর কল্পনা করা যায় না। "সূক্ষ্মতাপরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তো জীবঃ। পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৩৩ ॥"

শ্রুতিও বলেন, জীবাত্মা অণুপরিমিত। "এষঃ অণুঃ আত্মা। মুণ্ডক ।৩।১।৯ ॥" কাঠকোপনিষৎ বলেন—আত্মা "অণুপ্রমাণাৎ ॥ ১।২।৮ ॥-আত্মা অণুপ্রমাণ।" শ্বেতাশ্বতর-উপনিষৎ বলেন—"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৫।৯ ॥—কেশের অগ্রভাগকে যদি শতভাগ করা যায় এবং তাহারও প্রত্যেক ভাগকে যদি আবার একশত ভাগ করা যায়, তাহার সমান হইবে জীব ॥" অর্থাৎ কেশাগ্রের দশহাজার ভাগের এক ভাগের তুল্য ক্ষুদ্র হইল জীব।

ব্যাসদেবের বেদান্তসূত্রও জীবাত্মার অণুত্বের কথাই বলেন। ক্রমশঃ তাহা দেখান হইতেছে।

"উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্ ॥ ২।৩।১৯"-এই সূত্রে বলা হইয়াছে—জীবের যখন উৎক্রান্তি আছে, গতাগতি আছে, তখন জীব বিভু হইতে পারে না। জীব যে মধ্যমাকারও হইতে পারে না, তাহাও পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। কাজেই জীবের পরিমাণ হইবে অণু।

"স্বাত্মনা চ উত্তরয়োঃ ॥ ২।৩।২০ ॥-এই সূত্রে বলা হইয়াছে—পূর্ব্ব সূত্রের "গতি ও অগতি"—এই শেষ শব্দ দুইটীর (উত্তরয়োঃ) গৌণ অর্থ ধরিলে কোনও সার্থকতা থাকে না। "স্বাত্মনা"—জীবাত্মা নিজে সত্য সত্যই গমনাগমন করেন, ইহাই "যে বৈ কে চ অস্মাৎ লোকাৎ প্রযন্তি চন্দ্রসম্ এব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি ॥ কৌষিতকী ॥ ১।২ ॥ তস্মাৎ লোকাৎ পুনঃ এতি অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে ॥ বৃ, আ, ৪।৪।৬ ॥"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য। ইহাতেই পূর্ব্বসূত্রোক্ত "গতি ও অগতি"-শব্দদ্বয়ের সার্থকতা। জীবাত্মা যখন গতাগতি করে এবং ইহা যখন মধ্যমাকারও নহে, তখন ইহাই একমাত্র সিদ্ধান্ত যে—জীবাত্মা অণু।

ইহার পরে সূত্রকার নিজেই এক পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষটী হইতেছে এই—আত্মা অণু নহে, বৃহৎ; যেহেতু, আত্মা যে বৃহৎ—বিভু, এরূপ শ্রুতিবাক্য দৃষ্ট হয়। এই পূর্ব্বপক্ষখণ্ডনের জন্য ব্যাসদেব নিম্নলিখিত সূত্র করিয়াছেন।

"ন অণুঃ অতচ্ছ্রুতেঃ ইতি চেৎ ন ইতরাধিকারাৎ ॥ ২।৩।২১ ॥"—ন অণুঃ (আত্মা অণুপরিমাণ হইতে পারেনা, যেহেতু) অতৎশ্রুতেঃ (অনণুত্ব-শ্রুতেঃ—আত্মা অনণু, বৃহৎ, বিভু, এরূপ শ্রুতি বাক্য আছে), ইতি চেৎ (এরূপ যদি কেহ বলেন। ইহাই পূর্ব্বপক্ষের উক্তি। এই উক্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন) ন (না—আত্মা বিভু

নহে। যেহেতু) ইতরাধিকারাৎ (শ্রুতিতে যে আত্মাকে বৃহৎ বা বিভু বলা হইয়াছে, সেই আত্মা জীবাত্মা নহে; অন্য আত্মা, পরমাত্মা বা ব্রহ্ম)। এই সূত্রার্থ হইতে জানা গেল—ব্রহ্মই বিভু, জীবাত্মা কিন্তু অণু।

"স্বশব্দোন্মানাভ্যাং চ॥ ২।৩।২২॥"—এই সূত্রে বলা হইয়াছে—জীব যে অণু, তাহা "স্বশব্দ" এবং "উন্মান" দ্বারাই বুঝা যায়। "স্ব-শব্দ"—শ্রুতির উক্তি। শ্রুতি বলেন, জীবাত্মা অণু। "এষঃ অণুঃ আত্মা॥ মুণ্ডক॥ ৩।১।৯॥" "উন্মান"—বেদোক্ত পরিমাণ। "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ॥ শ্বেতাশ্বতর॥ ৫।৯॥"—এই শ্রুতিবাক্যে জীবাত্মার একটা পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে; ইহা হইতেও জানা যায়, জীবাত্মা অতি সূক্ষ্ম—অণু।

ইহার পরে সূত্রকার আরও একটি পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন, নিম্ন সূত্রে।

"অবিরোধঃ চন্দনবৎ॥ ২।৩।২৩॥"—এই সূত্রে বলা হইল—যদি কোনও পূর্ব্বপক্ষ আপত্তি উত্থাপন করেন যে, জীবাত্মা যদি অণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম হয়, তাহা হইলে সমগ্র দেহে কিরূপে শীত-গ্রীষ্ম-যন্ত্রণাদির অনুভূতি জন্মিতে পারে? তদুত্তরে বলা হইল—"অবিরোধঃ"—ইহাতে কোনও বিরোধ নাই। আত্মা অণুপরিমাণ হইলেও সমগ্রদেহে অনুভূতি জন্মিতে পারে। কিরূপে? "চন্দনবৎ"—একবিন্দু চন্দন দেহের একস্থানে সংলগ্ন হইলে সমগ্র দেহেই যেমন তৃপ্তির অনুভব হয়, তদ্রূপ আত্মা অণুপরিমিত হইলেও সমগ্রদেহে অনুভূতি সঞ্চারিত হইতে পারে।

এই উক্তির পরেও পূর্ব্বপক্ষ আর এক আপত্তি তুলিতেছেন। ব্যাসদেবও তাহা খণ্ডন করিয়াছেন—পরবর্ত্তী-সূত্রে।

"অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ ইতি চেৎ ন অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি॥ ২।৩।২৪॥"—যদি কেহ আপত্তি করেন যে, "অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ"—চন্দনবিন্দু দেহের একস্থানে অবস্থিত থাকে, তাতে তাহার স্নিগ্ধতাজনিত তৃপ্তির অনুভব সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু আত্মা তো সেরূপ দেহের এক স্থানে থাকে না। "ইতি চেৎ"—এইরূপ যদি কেহ বলেন, তাহা হইলে বলা যায়, "ন"—না, এইরূপ আপত্তির কোনও স্থান নাই। কেন? "অভ্যুপগমাৎ হৃদিহি"—আত্মাও (দেহের একস্থানে) হৃদয়ে বাস করে, ইহা শ্রুতিতে স্বীকৃত হইয়াছে। "হৃদি হি এষ আত্মা।" প্রশ্নোপনিষৎ॥ ৩। "স বা এষ আত্মা হৃদি। ছান্দোগ্য। ৮।৩।৩॥"

পুনরায় আপত্তি হইতে পারে যে, চন্দনের সূক্ষ্ম অংশগুলি সমগ্রদেহে ব্যাপ্ত হইয়া তৃপ্তি জন্মাইতে পারে; কিন্তু আত্মার তো কোনও সূক্ষ্ম অংশ নাই যে তাহা সকল দেহে ব্যাপ্ত হইয়া অনুভূতি বিস্তার করিবে। সুতরাং আত্মা সূক্ষ্ম হইলে সর্ব্বদেহে কিরূপে অনুভূতি জন্মিতে পারে? ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন,

"গুণাৎ আলোকবৎ॥ ২।৩।২৫॥"—"গুণাৎ"—আত্মার গুণ চৈতন্য সকলদেহে ব্যাপ্ত হইয়া সুখ-দুঃখের অনুভূতি জন্মায়। "আলোকবৎ"—আলোকের ন্যায়। প্রদীপ একস্থানে থাকিয়াও যেমন আলোক বিস্তার করিয়া সমগ্র ঘরখানিকে আলোকিত করে, তদ্রূপ।

এই উত্তরেও পূর্ব্বপক্ষ আপত্তি করিতে পারেন যে, গুণীকে আশ্রয় না করিয়া গুণ থাকিতে পারে না। দুগ্ধের গুণ শ্বেতবর্ণ দুগ্ধকে আশ্রয় করিয়াই থাকে; যেখানে দুগ্ধ নাই, সেখানে শ্বেতবর্ণ দেখা যায় না। আত্মার গুণ চৈতন্য। যেখানে আত্মা আছে, সেখানেই চৈতন্য থাকিতে পারে; যেখানে আত্মা নাই, সেখানে তো চৈতন্য থাকিতে পারে না। সুতরাং আত্মা যদি সমগ্রদেহকে ব্যাপিয়া না থাকে, আত্মা যদি অণুপরিমিত হয়, তাহা হইলে সমগ্রদেহে সুখ-দুঃখের অনুভূতি কিরূপে জন্মিতে পারে? এই আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন;

"ব্যতিরেকো গন্ধবৎ॥ ২।৩।২৬॥" "ব্যতিরেকঃ"—ব্যতিক্রম আছে; যেখানে গুণী থাকে না, সেখানেও স্থলবিশেষে গুণ থাকিতে পারে। "গন্ধবৎ"—যেমন গন্ধ। যেস্থানে ফুল নাই, সেস্থানেও ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। সুতরাং দেহের যেস্থানে আত্মা নাই, সেস্থানেও আত্মার গুণ চৈতন্য থাকিতে পারে।

অন্য এক সূত্রেও ব্যাসদেব উল্লিখিত উক্তির সমর্থন করিতেছেন।

"তথাচ দর্শয়তি॥ ২।৩।২৭॥" অণুপরিমিত আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করিয়াও যে সমগ্রদেহে চৈতন্য বিস্তার করিতে পারে, শ্রুতিতেও তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলেন—"আলোমভ্য আনখাগ্রেভ্যঃ॥৮।৮।১॥—লোম এবং নখাগ্রপর্য্যন্ত।"

আবার প্রশ্ন হইতে পারে, আত্মা এবং তাহার গুণ চৈতন্য বা জ্ঞান যদি পৃথক্ হয়, তাহা হইলে আত্মা একস্থানে থাকিলেও তাহার গুণ জ্ঞান সমগ্রদেহে ব্যাপ্ত হইতে পারে। জ্ঞান ও আত্মা যে পৃথক্ তাহার কোনও প্রমাণ আছে কিনা। তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন,

"পৃথক্ উপদেশাৎ॥ ২।৩।২৮॥"-হাঁ, আত্মা এবং জ্ঞান যে পৃথক্, শ্রুতিতে তাহার উপদেশ বা উল্লেখ আছে। কৌষিতকী শ্রুতি বলেন—"প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য॥৩।৬॥—জীবাত্মা প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের দ্বারা শরীরে সম্যক্‌রূপে আরোহণ করে।" এস্থলে আত্মা হইল আরোহণের কর্ত্তা এবং জ্ঞান হইল করণ; সুতরাং তাহারা দুই পৃথক্ বস্তু।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের আনুগত্যেই উল্লিখিত বেদান্ত-সূত্রগুলির তাৎপর্য্য-প্রকাশ করা হইল। জীবাত্মা হয় বিভু, না হয় মধ্যমাকৃতি, আর না হয় অণুপরিমিত হইবে। ইতঃপূর্ব্বে বেদান্তসূত্রের প্রমাণ উল্লেখপূর্ব্বক দেখান হইয়াছে—আত্মা মধ্যমাকার হইতে পারে না। "উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্॥ ২।৩।১৯॥" ইত্যাদি বেদান্ত সূত্রের উল্লেখপূর্ব্বক ইহাও দেখান হইয়াছে যে, শ্রুতিতে জীবাত্মার উৎক্রমণ ও যাতায়াতের কথা দেখা যায় বলিয়া আত্মা যে বিভু—সর্ব্বব্যাপক—হইতে পারেনা, তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। ইহা হইতেই সূত্রকার সিদ্ধান্ত করিলেন—আত্মা যখন বিভুও নয়, মধ্যমাকারও নয়, তখন নিশ্চয়ই অণুপরিমিত হইবে। তারপর, আত্মার অণুপরিমিতত্বের বিপক্ষে যতরকম আপত্তি থাকিতে পারে, ২।৩।২০ হইতে ২।৩।২৮ পর্য্যন্ত সূত্রসমূহে সূত্রকার নিজেই তৎসমস্ত খণ্ডন করিয়াছেন। এই সূত্রগুলিতে যত আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটীই জীবাত্মার বিভুত্বের অনুকূল। সূত্রকার ব্যাসদেব একে একে সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়া জীবাত্মার অণুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

শঙ্করমতের বিচার ও খণ্ডন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও উল্লিখিত সূত্রসমূহের ভাষ্যে বিভুত্ব খণ্ডন পূর্ব্বক অণুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, অব্যবহিত পরবর্ত্তী সূত্রের ভাষ্যেই শঙ্করাচার্য্য অন্যরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। সূত্রটী এই:—

"তদ্‌গুণসারত্বাৎ তু তদ্‌ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ॥২।৩।২৯॥" শ্রীপাদ রামানুজের মতে এই সূত্রটী জীবাত্মার পরিমাণ-বিষয়ক নয়। গোবিন্দভাষ্যেও এই সূত্রটী জীব-পরিমাণ-বিষয়ক বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। রামানুজের ভাষ্য দেখিলে মনে হয়, পূর্ব্বসূত্রের সহিত এই সূত্রের সম্বন্ধ—এইভাবে। পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে, জীবাত্মা ও তাহার গুণ জ্ঞান—দুই পৃথক্ বস্তু। এই সূত্রে বলা হইল, তাহারা পৃথক্ হইলেও স্থল-বিশেষে জীবকেও জ্ঞান বা বিজ্ঞান-শব্দে অভিহিত করা হয়—জীবের শ্রেষ্ঠ গুণ জ্ঞান বলিয়া, গুণী ও গুণের অভেদ মনন করিয়া। "তদ্‌গুণসারত্বাৎ"—এই স্থলে তদ্-শব্দের অর্থ জীব। তাহার গুণের সার হইতেছে জ্ঞান। এই জ্ঞান জীবের গুণসার বা শ্রেষ্ঠগুণ বলিয়া (জীবও তাহার গুণ পৃথক্ বলিয়া শ্রুতিতে উল্লেখ থাকিলেও) "তু"—কিন্তু "তদ্‌ব্যপদেশঃ"—জীবকে জ্ঞান বা বিজ্ঞান রূপেও অভিহিত করা হয়। যেমন, "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে—জীব যজ্ঞ করে।" অনুকূল উদাহরণও আছে। "প্রাজ্ঞবৎ"—প্রাজ্ঞের (বা পরমাত্মার) ন্যায়। পরমাত্মার শ্রেষ্ঠগুণ হইতেছে আনন্দ; তাই যেমন পরমাত্মাকে সময় সময় আনন্দ বলা হয় (আনন্দো ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ। তৈত্তি। ৩।৬॥), তদ্রূপ জীবাত্মার শ্রেষ্ঠগুণ জ্ঞান হওয়াতে জীবাত্মাকেও স্থলবিশেষে জ্ঞান বা বিজ্ঞান বলা হয়। ইহাই উক্ত সূত্রের রামানুজ-ভাষ্যের তাৎপর্য্য।

কিন্তু এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলেন, পূর্ব্বোল্লিখিত সূত্রসমূহে জীবাত্মার অণুত্বস্থাপনার্থ যাহা বলা হইয়াছে, তৎসমস্ত হইল পূর্ব্বপক্ষের উক্তি। বস্তুতঃ আত্মা অণু নহে, বিভু। "তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। নৈতদস্ত্যণুরাত্মেতি, উৎপত্ত্যশ্রবণাৎ।"

এস্থলে শ্রীপাদশঙ্করের যুক্তিগুলির উল্লেখপূর্ব্বক তৎসম্বন্ধীয় মন্তব্যগুলি ব্যক্ত হইতেছে। তাঁহার যুক্তিগুলি এই :—

(১) নৈতদস্ত্যণুরাত্মেতি, উৎপত্ত্যশ্রবণাৎ।—উৎপত্তির কথা শুনা যায় না বলিয়া আত্মা (জীবাত্মা) অণু হইতে পারে না।

মন্তব্য।—জীবাত্মা অনাদি, নিত্য; সুতরাং তাহার উৎপত্তি বা জন্ম থাকিতে পারে না। শ্রীপাদ বোধ হয় মনে করিতেছেন, উৎপত্তিই অণুত্বের একটী বিশেষ প্রমাণ। কিন্তু ইহা সঙ্গত নয়। অনন্ত কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি আছে; মায়াবদ্ধ জীবদেহের উৎপত্তি আছে; তাহারা কিন্তু অণুপরিমিত নহে। আর উৎপত্তি না থাকাই—অর্থাৎ নিত্যত্বই—যদি অণুত্ববিরোধী এবং বিভুত্বপ্রতিপাদক হয়, তাহা হইলে মায়াও বিভু হয়; যেহেতু বহিরঙ্গা মায়া নিত্যবস্তু; কিন্তু প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে মায়ার অবস্থান নাই বলিয়া মায়াকে ব্রহ্মের ন্যায় বিভু বলা যায় না। সুতরাং শ্রীপাদশঙ্করের এই যুক্তি বিচারসহ নহে।

(২) পরস্যৈব তু ব্রহ্মণঃ প্রবেশশ্রবণাৎ তাদাত্ম্যোপদেশাচ্চ পরমেব ব্রহ্ম জীব ইত্যুক্তম্। পরমেব চেদ্‌ব্রহ্ম জীবস্তস্মাৎ যাবৎ পরং ব্রহ্ম তাবানেব জীবো ভবিতুমর্হতি। পরস্য চ ব্রহ্মণো বিভুত্বম্ আম্নাতং তস্মাদ্ বিভুর্জীবঃ।—পরব্রহ্মেরই প্রবেশ ও তাদাত্ম্যের কথা শাস্ত্রে দেখা যায় বলিয়া পরব্রহ্মই জীব। সুতরাং ব্রহ্মের যে আকার, জীবেরও সেই আকারই হইবে। শ্রুতি বলেন, ব্রহ্ম বিভু; সুতরাং জীবও বিভু।

মন্তব্য।—কেবল যে পরব্রহ্মেরই প্রবেশ ও তাদাত্ম্যের কথা শুনা যায়, তাহা নহে। জীবেরও প্রবেশ ও তাদাত্ম্যের কথা শুনা যায়। প্রাকৃত দেহে জীবের প্রবেশ এবং মৃত্যুকালে সেই দেহ হইতে জীবের বহির্গমন প্রসিদ্ধ। প্রাকৃত স্থূল শরীরের সহিত জীবের তাদাত্ম্যের কথাও শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। স বায়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে স উৎক্রামন্ ম্রিয়মাণঃ পাপ্মানো বিজহাতি॥ বৃহ, আ, ৪।৩।৮॥"—সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের এই যুক্তিও বিচারসহ নহে।

(৩) জীবাত্মা যে বিভু, তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত শঙ্করাচার্য্য একটী শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা এই। "স চ বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু—ইত্যেবঞ্জাতীয়কা জীববিষয়কা বিভুত্ববাদাঃ শ্রৌতাঃ স্মার্ত্তাশ্চ সমর্থিতা ভবন্তি।"—এই সেই মহান্ অজ আত্মা, যিনি বিজ্ঞানময় এবং প্রাণসমূহে অবস্থিত ইত্যাদি।—এই জাতীয় জীববিষয়ক বিভুত্ব-প্রতিপাদক বাক্য শ্রুতি ও স্মৃতিদ্বারা সমর্থিত।"

মন্তব্য।—শ্রীপাদশঙ্কর এই শ্রুতিবাক্যটীকে জীববিষয়ক বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু ইহা যে জীববিষয়ক নয়, পরন্তু ব্রহ্ম-বিষয়কই, সমগ্র শ্রুতিটী দেখিলেই বুঝা যাইবে। সমগ্র শ্রুতিটী এই। "স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ। স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ানেষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায় তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেনৈতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণোভে হ্যেতে এষণে এব ভবতঃ স এষ নেতি নেত্যাত্মাগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্য্যো ন হি শীর্য্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন হি ব্যথতে ন রিষ্যত্যেতমু হৈ বৈতে ন তরত ইত্যতঃ পাপমকরবমিত্যতঃ কল্যাণমকরবমিত্যুভে উ হৈবৈষ এতে তরতি নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ॥ বৃহ, আ, ৪।৪।২২॥—এই মহান্ অজ বিজ্ঞানময় আত্মা, যিনি প্রাণসমূহে (ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতারূপে) অবস্থান করেন এবং যিনি (পরমাত্মারূপে ভূতগণের) হৃদয়াকাশে অবস্থান করেন, তিনি সকলের বশীকারক, সকলের নিয়ন্তা এবং সকলের অধিপতি। ইনি (শাস্ত্রবিহিত) সাধুকর্ম্মদ্বারা মহত্ত্ব প্রাপ্ত হন না, (শাস্ত্রনিষিদ্ধ) অসাধুকর্ম্মদ্বারাও লঘুত্ব প্রাপ্ত হন না। ইনি সর্ব্বেশ্বর, ভূতসমূহের অধিপতি,

ভূতসমূহের পালনকর্ত্তা, সমস্ত জগতের সেতু। এই সমস্ত লোকের মর্য্যাদারক্ষণের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপস্যা, কামোপভোগবর্জ্জন দ্বারা ইঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন। ইঁহাকে জানিয়াই লোক মুনি হয়। এই আত্মলোক লাভের নিমিত্তই লোক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বতন জ্ঞানিসকল প্রজা-কামনা করিতেন না—প্রজাদ্বারা আমার কি হইবে, এইরূপ মনে করিয়া। আত্মলোক লাভের আশায় তাঁহারা পুত্র-বিত্ত-স্বর্গাদিলোক-কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতেন। ইহা নয়, ইহা নয়—এইরূপ নিষেধমুখেই আত্মাকে জানিতে হয়। আত্মা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বলিয়া ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রাহ্য হন না; আত্মা অশীর্য্য বলিয়া শীর্ণ হন না; আত্মা আসক্তিহীন বলিয়া কোথাও আসক্ত হন না; আত্মা বদ্ধ হয়েন না, ব্যথিত হন না, বিনষ্ট হন না। আমি পাপ করিয়াছি বা পুণ্য করিয়াছি—এইরূপ অভিমান আত্মজ্ঞ ব্যক্তিকে আশ্রয় করেনা। আত্মজ্ঞ এই উভয়ের অতীত। কৃত বা অকৃত কিছুই আত্মজ্ঞকে অনুতপ্ত করে না।"

এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা গেল, উক্ত শ্রুতিটী জীববিষয়ক নহে। শ্রুতিবাক্যটীর মধ্যে "প্রাণেষু"-শব্দ দেখিলে শ্রুতিটী জীববিষয়ক বলিয়া মনে হইতে পারে বটে; কিন্তু পরবর্ত্তী অংশে "সর্ব্বস্য বশী, সর্ব্বস্যেশানঃ, সর্ব্বস্যাধিপতিঃ, সর্ব্বেশ্বরঃ" ইত্যাদি শব্দ এবং উপাসনার কথা থাকায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সকলের বশীকারক, সকলের নিয়ন্তা ও অধিপতি, ব্রাহ্মণগণের এবং ব্রহ্মলোকেচ্ছু জনগণের উপাস্য পরব্রহ্মই এই শ্রুতির বিষয়। "নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ। ২।৩।২১॥"-বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্যও বলেন—"স বা এষ মহানজ আত্মেতি * * * যদ্যপি যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষ্বিতি জীবস্যোপক্রমস্তথাপি যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মেতিমধ্যে জীবেতরং পরেশমধিকৃত্য মহত্ত্বপ্রতিপাদনাৎ তস্যৈব তত্ত্বং ন জীবস্যেতি।" প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবতারাও যে স্বরূপতঃ পরব্রহ্মই, তাহাই "প্রাণেষু"-শব্দে সূচিত হইতেছে। সুতরাং এই শ্রুতিটী পরব্রহ্মবিষয়কই, জীববিষয়ক নয়।

নাণুরতচ্ছ্রুতেঃ—ইত্যাদি ২।৩।২১-সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজও উল্লিখিত বৃহদারণ্যকের "স বা এষঃ মহান্ অজঃ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যকে পরব্রহ্ম-বিষয়ক বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

এমন কি শ্রীপাদশঙ্করাচার্য্যও "নাণুরতচ্ছ্রুতেঃ"-ইত্যাদি সূত্রের-ভাষ্যে বৃহদারণ্যকের উল্লিখিত বাক্যটীকে ব্রহ্মবিষয়কই বলিয়াছেন। ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন "স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু," "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ," "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যেবঞ্জাতীয়কা হি শ্রুতিরাত্মনোঽণুত্বং বিপ্রতিষিধ্যেতেতি চেৎ। নৈষ দোষঃ। কস্মাৎ। ইতরাধিকারাৎ। পরস্য হি আত্মনঃ প্রক্রিয়ায়াম্ এষা পরিমাণান্তরশ্রুতিঃ। ইহার মর্ম্ম এইরূপ। যদি বল—স বা এষ মহানজ-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য আত্মার অণুত্ববিরোধী, আত্মার বিভুত্বের প্রতিপাদক। উত্তরে বলা যায়—ঐ সকল শ্রুতিবাক্য আত্মার বিভুত্ব-প্রতিপাদকই বটে; কিন্তু তাতে কিছু দোষ নাই; কেননা, ইতরাধিকারাৎ। ঐ সকল শ্রুতিবাক্য হইতেছে ব্রহ্ম-প্রকরণের, জীব-প্রকরণের নহে। ভাষ্যের উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন—তস্মাৎ প্রাজ্ঞবিষয়ত্বাৎ পরিমাণান্তরশ্রবণস্য ন জীবস্যাণুত্বং বিরুধ্যতে।—"স বা মহানজ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মবিষয়ক বলিয়া (জীববিষয়ক নহে বলিয়া) জীবের অণুত্ব-বিরোধী নহে। এস্থলে শ্রীপাদশঙ্কর পরিষ্কার কথাতেই উল্লিখিত বৃহদারণ্যকের বাক্যটীকে ব্রহ্মবিষয়ক বলিয়াছেন। অথচ, "তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্‌ব্যপদেশঃ"-ইত্যাদি ২।৩।২৯-সূত্রের ভাষ্যে তাঁহার স্বীয় প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত সেই শ্রুতিবাক্যটীকেই তিনি জীববিষয়ক বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার সমগ্রভাষ্য যদি কেহ নিরপেক্ষভাবে বিচার করেন, দেখিতে পাইবেন, শ্রীপাদশঙ্করের একমাত্র লক্ষ্যই ছিল—জীব-ব্রহ্মের একত্বস্থাপন এবং সেই উদ্দেশ্যে জীবের বিভুত্ব-প্রতিপাদন। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অত্যধিক আগ্রহবশতঃ অনেক স্থলে মুখ্যাবৃত্তির অর্থের সঙ্গতি থাকাসত্ত্বেও তাঁহাকে শ্রুতির অর্থ করিবার সময়ে লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং স্থলবিশেষ একই শ্রুতিরই একস্থলে এক রকম অর্থ এবং অন্যস্থলে ঠিক বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যাহা হউক, আলোচ্যসূত্রের ভাষ্যে জীবের বিভুত্ব-প্রতিপাদনের চেষ্টা যে তাঁহার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী আলোচনা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে।

ইহার পরে শ্রীপাদশঙ্কর জীবের অণুত্ব-প্রতিপাদক কয়েকটী বেদান্তসূত্রের আলোচনা করিয়া প্রকারান্তরে ব্যাসদেবের ত্রুটীই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধেও তাঁহার যুক্তিগুলির উল্লেখপূর্ব্বক মন্তব্য প্রকাশ করা হইতেছে। তাঁহার যুক্তিগুলি এই।

(১) "ন চ অণোর্জীবস্য সকলশরীরগতা বেদনা উপপদ্যতে।—জীব যদি অণু হয়, তাহা হইলে সমগ্র শরীরে বেদনার উপলব্ধি সঙ্গত হয় না।" তাঁহার যুক্তি এই—যদি বল ত্বক্ সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া থাকে; ত্বকের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই সমস্ত দেহে বেদনার বিস্তার হইতে পারে। তিনি বলেন—কিন্তু তাহা হয় না। পায়ে যখন কাঁটা ফুটে, তখন কেবল পায়েই বেদনা অনুভূত হয়; সমগ্র দেহে হয় না। শঙ্করের এই যুক্তি সূত্রকার ব্যাসদেবের "অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ ইতি চেন্ন অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি॥ ২।৩।২৪॥"—সূত্রেরই প্রতিবাদ।

মন্তব্য। ত্বকের মধ্যে যে শিরা উপশিরা ধমনী আদি আছে, তাহারাই বেদনার অনুভূতিকে বহন করিয়া শরীরে বিস্তারিত করে। যেখানে যেখানে বা যতদূর পর্য্যন্ত শিরাদি বেদনার অনুভূতিকে বহন করিয়া নিতে পারে, সেখানে সেখানে বা ততদূর পর্য্যন্তই বেদনা অনুভূত হইতে পারে। সকল বেদনাই যে সমস্ত দেহে একই সময়ে বিস্তৃত হইবে, তাহা নয়। ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়ও নয়। প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে এই যে, আত্মা যখন অণুরূপে কেবলমাত্র হৃদয়েই অবস্থিত, হৃদয়ের অণুপরিমাণ স্থানের বাহিরে যখন তাহার ব্যাপ্তি নাই, অথচ সমগ্রদেহটী যখন জড়, তখন শরীরের যে কোনও স্থানেই হৃদয়স্থিত আত্মার চেতনার ব্যাপ্তি হইতে পারে কিনা। সূত্রকার বলিতেছেন—পারে। সমগ্রদেহেই চেতনা ব্যাপ্ত আছে। তাহার প্রমাণ কি? কাঁটা ফুটাইয়া দেখ, প্রমাণ পাইবে। শরীরের যে কোনও স্থানে কাঁটা ফুটাইলেই বেদনা অনুভূত হইবে। তাহাতেই বুঝা যায়, শরীরের সর্ব্বত্রই চেতনার ব্যাপ্তি আছে; এই চেতনা আত্মা হইতেই আসিয়া থাকে। এক স্থানে কাঁটা ফুটাইলে একই সময়ে একসঙ্গে সমগ্র শরীরে বেদনা সঞ্চারিত না হইলেও তদ্দ্বারা সমগ্র শরীরে চেতনার অস্তিত্বের অভাব প্রমাণিত হয় না। সুতরাং 'জীব অণু হইলে সমগ্রদেহে বেদনার বিস্তৃতি উপপন্ন হয় না'—ইহা প্রমাণ করার জন্য শ্রীপাদশঙ্কর পায়ে-কাঁটা ফুটার যে দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার উপযোগিতা নাই।

(২) ব্যাসদেব "গুণাৎ বালোকবৎ॥ ২।৩।২৫॥"—সূত্রে বলিয়াছেন, প্রদীপ একস্থানে থাকিয়াও যেমন সমগ্র গৃহে আলো বিস্তার করে, তদ্রূপ জীবাত্মা হৃদয়ে থাকিয়াও সমগ্রদেহে তাহার গুণ—চেতনা বা জ্ঞান—বিস্তার করে। ইহাতে যদি কেহ আপত্তি করেন যে, গুণ তো গুণীতে থাকে, গুণীর বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই; আত্মার গুণ কিরূপে আত্মার বাহিরে—শরীরে—ব্যাপ্ত হইবে? তদুত্তরে ব্যাসদেব "ব্যতিরেকো গন্ধবৎ॥ ২।৩।২৬॥"—সূত্রে বলিতেছেন—ব্যতিরেক আছে; যে স্থানে গুণী থাকে না, সে স্থানেও সেই গুণীর গুণ থাকিতে পারে; যেমন গন্ধ।

উক্ত দুইটী সূত্রে ব্যাসদেবের উক্তি সম্বন্ধে শ্রীপাদশঙ্কর—বলিতেছেন—"ন চ অণোর্গুণব্যাপ্তিরুপপদ্যতে গুণস্য গুণদেশত্বাৎ। গুণত্বমেব হি গুণিনমাশ্রিত্য গুণস্য হীয়েত।—আত্মা যদি অণু হয়, সমগ্রদেহে তাহার গুণ ব্যাপ্ত হইতে পারে না; যেহেতু গুণ গুণীতেই থাকে। গুণীর আশ্রয়ে গুণ না থাকিলে তাহার গুণত্বই থাকে না।" তারপর তিনি বলিয়াছেন—"প্রদীপপ্রভায়াশ্চ দ্রব্যান্তরত্বং ব্যাখ্যাতম্। প্রদীপের প্রভাও ভিন্ন দ্রব্য।" এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, প্রভা প্রদীপের গুণ নহে, প্রদীপ যেমন একটী দ্রব্য, প্রভাও তেমনি একটী দ্রব্য। প্রদীপ হইল ঘনত্বপ্রাপ্ত তেজ, আর প্রভা হইল তরল তেজ। "নিবিড়াবয়বং হি তেজোদ্রব্যং প্রদীপঃ, প্রবিরলাবয়বন্তু তেজোদ্রব্যমেব প্রভেতি।"

তিনি আরও বলিয়াছেন—"চৈতন্যমেবহি অস্য স্বরূপমগ্নেরিবৌষ্ণ্য-প্রকাশৌ, নাত্র গুণগুণিবিভাগো বিদ্যতে ইতি।—উষ্ণতা এবং প্রকাশ যেমন অগ্নির স্বরূপ, তদ্রূপ চৈতন্যও আত্মার স্বরূপ। এস্থলে গুণ-গুণি বিভাগ নাই।" অর্থাৎ চৈতন্য আত্মার গুণ নহে, ইহাই তাঁহার বক্তব্য।

উল্লিখিত যুক্তিসমূহ দ্বারা শ্রীপাদ শঙ্কর প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে, "গুণাৎ বালোকবৎ।" সূত্রে ব্যাসদেব যে জ্ঞান বা চৈতন্যকে আত্মার গুণ বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে।

যাহাহউক, তারপর তিনি বলিয়াছেন—"গন্ধোঽপি গুণত্বাভ্যুপগমাৎ সাশ্রয় এব সঞ্চরিতুমর্হতি অন্যথা গুণত্ব-হানিপ্রসঙ্গাৎ।—গন্ধ গুণ বলিয়া গন্ধের আশ্রয় গুণীর সহিতই সঞ্চারিত হয়, অন্যথা তাহার গুণত্ব হানি হয়।" তাঁহার এই উক্তির অনুকূলে তিনি ব্যাসদেবের একটী উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। "উপলভ্যাপ্সু চেদ্গন্ধং কেচিদ্ব্রূয়ুরনৈপুণাঃ। পৃথিব্যামেব তং বিদ্যাদপোবায়ুঞ্চ সংশ্রিতমিতি।—জলে গন্ধ অনুভব করিয়া যদি কোন অনিপুণ ব্যক্তি জলের গন্ধ আছে বলে, তবে সে গন্ধ পৃথিবীরই জানিবে। পৃথিবীর গন্ধই জলকে এবং বায়ুকে আশ্রয় করে।"

মন্তব্য। "গুণাৎ বালোকবৎ॥"—সূত্র সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিতেছেন যে, আত্মা যদি অণু হয়, সমগ্রদেহে তাহার গুণ চৈতন্যের ব্যাপ্তি সম্ভব নয়; যেহেতু গুণীর বাহিরে গুণ থাকিতে পারেনা। সুতরাং চৈতন্য যখন সমগ্র দেহেই আছে, তখন বুঝিতে হইবে আত্মাও সমগ্রদেহব্যাপী। এইরূপ আপত্তির আশঙ্কা করিয়াই ব্যাসদেব "ব্যতিরেকো গন্ধবৎ॥"-সূত্র করিয়াছেন। এই সূত্রই শ্রীপাদ শঙ্করের আপত্তির উত্তর।

আত্মার গুণ চৈতন্যের সঙ্গে আলোকের (প্রভার) উপমা দেওয়ায় প্রভাকে প্রদীপের গুণই বলা হইয়াছে। শ্রীপাদশঙ্কর তাহাতে আপত্তি করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রদীপ ও প্রভা একই তেজোজাতীয় বস্তু—ঘনত্বপ্রাপ্ত তেজ প্রদীপ, আর, তরল তেজঃ প্রভা। এক জাতীয় বস্তু বলিয়া প্রভা প্রদীপের গুণ হইতে পারেনা। প্রভা প্রদীপের স্বরূপ।

চৈতন্যসম্বন্ধেও তিনি তাহাই বলেন। উষ্ণতা এবং প্রকাশ (প্রভা) যেমন অগ্নির স্বরূপ, চৈতন্যও তেমনি আত্মার স্বরূপ। চৈতন্য আত্মার গুণ নহে।

"গুণাৎ বালোকবৎ॥—সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য নিজেই কিন্তু চৈতন্যকে আত্মার গুণ বলিয়াছেন। "চৈতন্য-গুণব্যাপ্তের্বাঽণোরপি সতো জীবস্য সকল-দেহব্যাপিকার্য্যং ন বিরুধ্যতে।—জীব সূক্ষ্ম অণু হইলেও চৈতন্যগুণের ব্যাপ্তিতে সকলদেহব্যাপী কার্য্য সম্পন্ন করে।" আবার "তথা চ দর্শয়তি॥ ২।৩।২৭॥"-সূত্রের ভাষ্যেও তিনি চৈতন্যকে আত্মার গুণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। "আলোমভ্য আনখাগ্রেভ্যঃ ইতি চৈতন্যেন গুণেন সমস্তশরীরব্যাপিত্বং দর্শয়তি।" পরবর্ত্তী "পৃথগুপদেশাৎ ২।৩।২৮॥"-সূত্রের ভাষ্যেও তিনি চৈতন্যকে আত্মার গুণ বলিয়াছেন। "প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য ইতি চাত্মপ্রজ্ঞয়োঃ কর্ত্তৃকরণভাবেন পৃথগুপদেশাৎ চৈতন্যগুণেনৈবাস্য শরীরব্যাপিতাঽবগম্যতে।" কেবল উল্লেখ মাত্র নয়, চৈতন্য যে আত্মার গুণ, তাহার সমর্থক শ্রুতিবাক্যও তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এস্থলে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তিদ্বারাই তাঁহার আপত্তির উত্তর দেওয়া হইল।

আর জীব চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ—জ্ঞাতা নহেন, কেবল জ্ঞানমাত্র, ইহাই যদি আচার্য্যপাদের অভিপ্রায় হয়, তাহা কিন্তু বেদান্তসম্মত হইবে না। যেহেতু, "জ্ঞঃ অতএব॥ ২।৩।১৮॥"-এই বেদান্তসূত্রে জীবকে জ্ঞাতা বলা হইয়াছে। (পরবর্ত্তী "জীব জ্ঞানস্বরূপ এবং জ্ঞাতা"—প্রবন্ধাংশে শ্রুতিপ্রমাণাদি দ্রষ্টব্য)।

যাহা হউক, চৈতন্য আত্মার গুণ কি স্বরূপ, প্রভা প্রদীপের গুণ কি স্বরূপ—না কি স্বরূপ এবং গুণ উভয়ই, এস্থলে সে বিচারের বিশেষ কোনও প্রয়োজন নাই। ব্যাসদেব এস্থলে সেই বিচার করিতেও বসেন নাই। গুণ ও গুণীতে, শক্তি ও শক্তিমানে যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ, তাহা অন্যত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেখানে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ, সেখানে অভেদ-বুদ্ধিতে শক্তিকে স্বরূপও বলা যায়, আবার ভেদ-বুদ্ধিতে শক্তিকে গুণও বলা যায়। শ্রীপাদ শঙ্কর যে বলিয়াছেন—"নাত্র গুণগুণিবিভাগো বিদ্যতে", একভাবে দেখিতে গেলে একথা মিথ্যা নয়। যেহেতু, গুণ এবং গুণী—অগ্নি এবং তাহার উষ্ণতার ন্যায়, মৃগমদ এবং তাহার গন্ধের ন্যায়, অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ; তথাপি কিন্তু অগ্নির বহির্দ্দেশেও উষ্ণতার এবং মৃগমদের বহির্দ্দেশেও তাহার গন্ধের ব্যাপ্তি দৃষ্ট হয়। ইহাই ভেদাভেদ-সম্বন্ধের মূল। এস্থলে সে বিচার অপ্রাসঙ্গিক। প্রভা প্রদীপের গুণ হউক বা না হউক, প্রদীপ হইতে প্রভা বিস্তারিত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। বস্তুতঃ এই সূত্রে ব্যাসদেব চৈতন্য ও প্রভার (আলোকের) বিস্তৃতিরই সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন, তাহাদের গুণত্বের প্রতি নয়। প্রদীপ হইতে প্রভা যেমন বিস্তৃত হয়, আত্মা

হইতে চৈতন্যও তেমনি বিস্তৃত হয়—ইহা প্রকাশ করাই ব্যাসদেবের উদ্দেশ্য। প্রদীপের প্রভা প্রদীপের বাহিরে বিস্তৃত হয় না,—ইহা যদি শঙ্করাচার্য্য প্রমাণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলেই ব্যাসদেবের উপমা ব্যর্থ হইত, চৈতন্য যে আত্মা হইতে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে, তাহা অপ্রমাণিত হইত। কিন্তু আচার্য্যপাদ যখন তাহা করেন নাই, তখন আলোচ্য প্রসঙ্গে তাঁহার এই আপত্তিরও কোনও সার্থকতা দেখা যায় না।

গন্ধ যে গন্ধের আধারে বা বাহিরেও বিস্তৃত হয়, "ব্যতিরেকো গন্ধবৎ"—সূত্রে ব্যাসদেব তাহাই বলিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য বলেন—গন্ধ কখনও গন্ধের আশ্রয়কে ত্যাগ করিতে পারে না। তাঁহার উক্তির অনুকূলে তিনি ব্যাসদেবের যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার উক্তি সমর্থিত হয় বলিয়া মনে হয় না; বরং ব্যাসদেবের সূত্রোক্তিই যেন সমর্থিত হয়। কারণ, ব্যাসদেব বলিয়াছেন—পৃথিবীতেই গন্ধ থাকে, তাহা জলে এবং বায়ুতে সঞ্চারিত হয়। গন্ধ পৃথিবীতেই থাকে বটে, কিন্তু জলে এবং বায়ুতেও তাহা বিস্তৃতি লাভ করে। তদ্রূপ, আত্মার গুণ চৈতন্য, আত্মাতেই থাকে বটে, কিন্তু দেহেও তাহা বিস্তৃত হয়।

গুণ গুণীকে ত্যাগ করে না—সত্য। রূপও একটা গুণ; এই গুণটী রূপবানেই থাকে, তাহার বাহিরে আসে না। অন্যান্য কোনও কোনও গুণসম্বন্ধেও এইরূপ হইতে পারে। কিন্তু গন্ধ সম্বন্ধে ব্যাতিক্রম আছে—গন্ধ গন্ধের আশ্রয়ের বাহিরেও বিস্তৃতি লাভ করে, ইহাই ব্যাসদেবের সূত্রের মর্ম্ম। গন্ধসম্বন্ধে যে এই ব্যতিক্রম আছে, "ব্যতিরেকো গন্ধবৎ"—সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এই ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন—"যদি বল, গুণ যখন স্বীয় আশ্রয় ব্যতীত অন্যত্র থাকে না, তখন মনে করিতে হইবে, গন্ধদ্রব্যের পরমাণুকে আশ্রয় করিয়াই গন্ধ নাসাতে প্রবেশ করে, তখনই গন্ধের অনুভূতি হয়। তাহা হইতে পারে না; যেহেতু, যদি গন্ধকে বহন করিয়া দ্রব্যপরমাণুই নাসাতে আসিত, তাহা হইলে দ্রব্যের গুরুত্ব (ওজন) কমিয়া যাইত; বাস্তবিক, তাহা কমে না; বিশেষতঃ পরমাণু অতীন্দ্রিয় বস্তু বলিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়; অথচ নাগকেশরাদির গন্ধ স্ফুটভাবেই অনুভূত হয়। লৌকিক প্রতীতিই এই যে—গন্ধেরই ঘ্রাণ পাওয়া যায়, গন্ধবান্ দ্রব্যের ঘ্রাণ নয়। আবার যদি বল—রূপাদির যেমন আশ্রয় ব্যতিরেকে উপলব্ধি হয় না, গন্ধেরও তদ্রূপ আশ্রয় ব্যতিরেকে উপলব্ধি অসম্ভব। তাহা নয়, "ন, প্রত্যক্ষত্বাৎ অনুমানাপ্রবৃত্তেঃ।—আশ্রয় ব্যতিরেকেও গন্ধের অনুভব, ইহা প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষস্থলে অনুমানের স্থান নাই।" শ্রীপাদ শঙ্করের এই যুক্তিই "তদ্গুণসারত্বাত্তু"—ইত্যাদি সূত্রপ্রসঙ্গে অণুত্ব-খণ্ডনের প্রতি তাঁহার অনুরূপ যুক্তির উত্তর।

যাহা হউক, ইহার পরে তিনি "তদ্গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ॥ ২।৩।২৯"-সূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন। এই সূত্রের শ্রীরামানুজভাষ্যের মর্ম্ম পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—"তস্যা বুদ্ধের্গুণাস্তদ্গুণা ইচ্ছাদ্বেষঃ সুখং দুঃখমিত্যেবমাদয় স্তদ্গুণাঃ সারঃ প্রধানং যস্যাত্মনঃ সংসারিত্বে সম্ভবতি স তদ্গুণসারস্তস্য ভাবস্তদ্গুণসারত্বম্। নহি বুদ্ধের্গুণৈর্বিনা কেবলস্যাত্মনঃ সংসারিত্বমস্তি। বুদ্ধ্যুপাধিধর্ম্মাধ্যাসনিমিত্তং হি কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিলক্ষণং সংসারিত্বম-কর্ত্তুরভোক্তুশ্চাসংসারিণঃ নিত্যমুক্তস্য সত আত্মনঃ। তস্মাত্তদ্গুণসারত্বাদ্ বুদ্ধিপরিমাণেনাস্য পরিমাণব্যপদেশঃ। তদুৎক্রান্ত্যাদিভিশ্চাস্যোৎক্রান্ত্যাদিব্যপদেশঃ, ন স্বতঃ।—ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখাদি বুদ্ধিরই গুণ; বুদ্ধিই এসমস্ত গুণের সার। আত্মার স্বরূপতঃ কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি নাই; বুদ্ধির উপাধিসম্ভূত ধর্ম্মের অধ্যাস বশতঃই আত্মাতে কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি, তাহাতেই তাহার সংসারিত্ব। বুদ্ধির গুণ ব্যতীত আত্মার (পরমাত্মার বা ব্রহ্মের) সাংসারিত্ব হইতে পারে না। এই বুদ্ধির পরিমাণ অনুসারেই আত্মাতে (সূক্ষ্মত্বাদি) পরিমাণের ব্যপদেশ। বুদ্ধির উৎক্রমণাদি বশতঃই আত্মার উৎক্রমণাদিরও ব্যপদেশ। আত্মার নিজের উৎক্রান্ত্যাদি নাই।"

মন্তব্য। ভাষ্যারম্ভের পূর্ব্বে অণুত্বখণ্ডনের জন্য শ্রীপাদ শঙ্কর যতগুলি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার একটীও যে বিচারসহ নহে, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। সুতরাং এই সূত্রের ভাষ্যদ্বারাই তাঁহাকে জীবের বিভুত্ব প্রতিপন্ন করিতে হইবে। কিন্তু বিভুত্ব প্রতিপাদনের যুক্তির মধ্যেই তিনি জীবের বিভুত্ব ধরিয়া লইয়াছেন,—যেহেতু তিনি মায়ার বুদ্ধি-উপাধিযুক্ত ব্রহ্মকেই জীব বলিতেছেন। সুতরাং ইহা একটী হেত্বাভাস-নামক দোষ হইতেছে; তাই ন্যায়সঙ্গত যুক্তি বা প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

তিনি আরও বলিয়াছেন—“এমমুপাধিগুণসারত্বাজ্জীবস্যাণুত্বাদিব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ। যথা প্রাজ্ঞস্য পরমাত্মনঃ সগুণেষু উপাসনাসু উপাধিগুণসারত্বাদ্ অণীয়স্ত্বাদিব্যপদেশঃ”-ইত্যাদি।—সগুণ উপাসনায় উপাধিগুণপ্রাধান্যে পরমাত্মাকে যেমন অণু, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস ইত্যাদি বলা হয়, তদ্রূপ উপাধির গুণপ্রাধান্যে জীবকেও অণু বলা হইয়াছে।

মন্তব্য। এই স্থত্রের “প্রাজ্ঞবৎ”-শব্দের “বৎ”-অংশ হইতেই বুঝায়, ব্যাসদেব এই স্থত্রে একটী উপমার অবতারণা করিয়াছেন। দুইটী পৃথক্ বস্তু না হইলে উপমা হয় না—একটী উপমান এবং অপরটী উপমেয়। যেমন, চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখ ; এস্থলে চন্দ্র ও মুখ দুইটী পৃথক বস্তু ; সৌন্দর্য্যাংশে তাদের সাদৃশ্য। স্থত্রে বলা হইয়াছে—প্রাজ্ঞের (ব্রহ্মের) যেমন ব্যপদেশ হয়, তেমনি জীবেরও ব্যপদেশ। সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম দুইটী পৃথক্ বস্তু না হইলে উপমাই হইতে পারে না। শঙ্করাচার্য্য জীবকেও ব্রহ্ম বলাতে স্থত্রটীর স্থুল অর্থ দাঁড়ায় এই—ব্রহ্মের যেমন ব্যপদেশ, তেমনি ব্রহ্মেরও ব্যপদেশ। যদি বল জীবকে তিনি তো ব্রহ্ম বলিতেছেন না, মায়ার বুদ্ধি-উপাধিযুক্ত ব্রহ্মই বলিতেছেন। উত্তর এই—প্রকরণ হইতেছে জীবস্বরূপসম্বন্ধে—শুদ্ধজীব-সম্বন্ধে, মায়াবদ্ধ সাংসারিক জীবসম্বন্ধে নহে। মায়াবদ্ধ জীব শুদ্ধ জীব নয়। শঙ্করাচার্য্যের মতে জীবের স্বরূপই হইল ব্রহ্ম। ব্যাসদেবও তাঁহার স্থত্রে জীবস্বরূপের বা শুদ্ধজীবের সঙ্গেই ব্যপদেশ-বিষয়ে ব্রহ্মের উপমা দিয়াছেন। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের মত অনুসারে স্থত্রটীর স্থুলার্থ হইবে—“ব্রহ্মের যেমন ব্যপদেপ, ব্রহ্মেরও তেমনি ব্যপদেশ।” ইহার কোনও অর্থই হয় না ; এবং ইহাতে ব্যাসদেবের উপমাও থাকে না।

আরও বক্তব্য আছে। জীবকে তিনি মায়ার উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম বলিয়াছেন। আর যে ব্রহ্মের উপাসনার কথা শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন, তাঁহাকেও তিনি মায়ার উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম বলিয়াছেন—সগুণেষু উপাসনাসু উপাধিগুণ-সারত্বাদ্ অণীয়স্ত্বাদিব্যপদেশঃ। এবং স্থত্রস্থ “প্রাজ্ঞ”-শব্দে সেই ব্রহ্মকেই তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহা হইলে তাঁহার কথা অনুসারে স্থত্রটীর স্থুলার্থ দাঁড়ায়—মায়ার উপাধিযুক্ত (সগুণ) ব্রহ্মের যেমন ব্যপদেশ, মায়ার উপাধিযুক্ত (জীবরূপ) ব্রহ্মেরও তেমনি ব্যপদেশ। ইহাও পূর্ব্ববৎ মূল্যহীন। বিশেষতঃ প্রকরণসঙ্গতও নয় ; যেহেতু, শুদ্ধজীব-বিষয়েই প্রকরণ ; মায়াবদ্ধ সংসারী জীব সম্বন্ধে নহে।

মায়োপহত ব্রহ্মই যে জীব, এবং মায়োপহত ব্রহ্মের উপাসনার কথাই যে শ্রুতি বলিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্যের এই মত শ্রুতিসঙ্গতও নয়।

যাহা হউক, স্থত্রে অবতারিত উপমাদ্বারাই ব্যাসদেব জানাইতেছেন যে—জীব ও ব্রহ্ম দুইটী পৃথক্ বস্তু। সুতরাং ব্রহ্ম যখন বিভু, তখন জীব বিভু হইতে পারে না। কারণ, দুইটী পৃথক্ বিভু বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

তারপর উৎক্রমণ সম্বন্ধে। তিনি বলিয়াছেন, “বুদ্ধির উৎক্রমণাদিবশতঃই আত্মার উৎক্রমণাদিরও ব্যপদেশ। আত্মার নিজের উৎক্রান্ত্যাদি নাই।” ইহাও ব্যাসদেবের “উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্॥ ২।৩।১৯॥”-স্থত্রের উক্তিরই প্রতিবাদ। যাহা হউক, এই স্থত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদশঙ্করই যে সকল শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়, উৎক্রমণাদি স্বয়ং জীবেরই, বুদ্ধির নয়। “স যদা অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি সহ এব এতৈঃ সর্ব্বৈঃ উৎক্রামতি। কৌষিতকী উপনিষৎ॥ ৩।৩॥—সে (জীব) যখন দেহত্যাগ করিয়া গমন করে, তখন এ সমস্তের (বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির) সহিতই গমন করে।” এস্থলে উৎক্রান্তি দেখান হইল। “যে বৈ কে চ অস্মাৎ লোকাৎ প্রযন্তি চন্দ্রসম্ এব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি॥ কৌষিতকী॥ ১।২॥—যাহারা এই পৃথিবী হইতে গমন করে, তাহারা সকলে চন্দ্রলোকেই গমন করে।” এস্থলে জীবের গতি দেখান হইল। “তস্মাৎ লোকাৎ পুনঃ এতি অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে॥ বৃহদারণ্যক॥ ৪।৪।৬॥—কর্ম্ম করিবার জন্য পুনরায় পরলোক হইতে এই পৃথিবীতে আসে।” এস্থলে আগমন দেখান হইল। এসমস্ত শ্রুতিবাক্যের কোনওটীতেই বুদ্ধির গমনাগমন বা উৎক্রমণের কথা বলা হয় নাই, জীবের (জীবাত্মার) গমনাগমনাদির কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং এই প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য্যের উক্তি শ্রুতিবিরোধী বলিয়া শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না।

ভাষ্যের মধ্যে, "বালাগ্রশতভাগস্য"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক জীবের বিভুত্ব-প্রতিপাদনার্থ শ্রীপাদ-শঙ্কর একটা যুক্তিও দেখাইয়াছেন। তাহাও বিচারসহ নয়। সম্পূর্ণ শ্রুতিবাক্যটী হইতেছে এই। "বালাগ্র-শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য তু। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥" এই বাক্যটীর দুইটী অংশ। প্রথমাংশ হইতেছে—"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য তু। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ।" আর দ্বিতীয়ার্দ্ধ হইতেছে—"স আনন্ত্যায় কল্পতে।" প্রথমার্দ্ধে জীবের সূক্ষ্মত্বের বা অণুত্বের কথা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে জীবের আনন্ত্যের কথা বলা হইয়াছে। আনন্ত্য অর্থ অনন্তের ভাব। অনন্ত অর্থ—যাহার অন্ত নাই। অন্ত অর্থ—সীমাও হইতে পারে, শেষ বা বিনাশ বা ধ্বংসও হইতে পারে। সীমা অর্থ ধরিলে অনন্ত-শব্দের অর্থ হয় অসীম বা বিভু এবং আনন্ত্য-শব্দের অর্থ হইবে—বিভুত্ব। আর অন্ত-শব্দের শেষ বা ধ্বংস বা বিনাশ অর্থ ধরিলে অনন্ত-শব্দের অর্থ হইবে—ধ্বংসহীন বা অবিনাশী অর্থাৎ নিত্য এবং আনন্ত্য-শব্দের অর্থ হইবে নিত্যত্ব। শঙ্করাচার্য্য বিভুত্ব অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। তদনুসারে তিনি বলিয়াছেন—"বালাগ্রশতভাগস্য"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জীবকে (প্রথমার্দ্ধে) সূক্ষ্মও বলা হইয়াছে এবং (দ্বিতীয়ার্দ্ধে) বিভুও বলা হইয়াছে। একই জীবের অণুত্ব ও বিভুত্ব সম্ভব নয়। একটাই পারমার্থিক তত্ত্ব-রূপে গ্রহণ করিতে হইবে—জীবের বিভুত্বই পারমার্থিক; তাহার অণুত্ব হইল ঔপচারিক অথবা দুর্জ্ঞেয়ত্ব-জ্ঞাপক। এই যুক্তিদ্বারা তিনি জীবের বিভুত্ব স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন।

মন্তব্য। উল্লিখিত শ্রুতির উক্তরূপ অর্থ করিতে যাইয়া শ্রীপাদ শঙ্কর লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয়ে শ্রুতিবাক্যের পূর্ব্বার্দ্ধের অর্থকে উপেক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্র বলেন, যেস্থলে মুখ্যাবৃত্তির অর্থের সঙ্গতি থাকে না, কেবলমাত্র সেস্থলেই লক্ষণার আশ্রয় নেওয়া যায়। মুখ্যাবৃত্তির সঙ্গতি থাকিলে লক্ষণার আশ্রয় দূষণীয় (১।৭।১০৩-৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। আনন্ত্য-শব্দের নিত্যত্ব অর্থ গ্রহণ করিলে মুখ্যাবৃত্তির অর্থের সঙ্গতি থাকে। আনন্ত্য-শব্দের নিত্যত্ব অর্থে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে জীবের নিত্যত্ব সূচিত হয়, ইহা শাস্ত্রসম্মত কথাই। সমগ্র-বাক্যটীর তাৎপর্য্য হইবে এই—জীব সূক্ষ্ম এবং এই সূক্ষ্ম জীব নিত্যও। ইহা বেদান্তসূত্র-সম্মত। বেদান্তের গোবিন্দভাষ্যেও আনন্ত্য-শব্দের নিত্যত্ব অর্থই গৃহীত হইয়াছে। "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ইতি শ্বেতাশ্বতরৈঃ। তাভ্যামণুরেব সঃ। আনন্ত্যশব্দো মুক্ত্যভিধায়ী। অন্ত্যো মরণং তদ্রাহিত্যমানন্ত্যমিত্যর্থঃ॥ স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ-ইতি॥ ২।৩।২২ সূত্রস্য গোবিন্দভাষ্যঃ॥" শ্রীজীবগোস্বামীর মতে এই শ্রুতির আনন্ত্য-শব্দ সংখ্যাজ্ঞাপক। জীবের সংখ্যা অনন্ত। উক্ত শ্রুতির উল্লেখপূর্ব্বক তিনি বলিয়াছেন—"তদেবমনন্তা এব জীবাখ্যাস্তটস্থাঃ শক্তয়ঃ। পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৪৪॥" এই অর্থেও মুখ্যাবৃত্তির অর্থের সঙ্গতি থাকে। জীব স্বরূপে অণুতুল্য সূক্ষ্ম, সংখ্যায় অনন্ত। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের গৌণার্থ এবং তদনুগত যুক্তি শাস্ত্রসম্মত হইতে পারে না।

শ্রুতিবাক্যটীর প্রথমার্দ্ধে জীবের যে সূক্ষ্মত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহা পরিমাণগত সূক্ষ্মত্ব। কেশের অগ্রভাগের দশসহস্রভাগের এক ভাগের তুল্যই জীবের পরিমাণ—এই উক্তিই তাহার প্রমাণ। ইহাই স্পষ্টার্থ—কষ্টকল্পনাপ্রসূত অর্থ নহে। পরিমাণগত সূক্ষ্মত্বের স্পষ্ট উল্লেখ থাকায় ঔপচারিক বা দুর্জ্ঞেয়ত্বসূচক সূক্ষ্মত্বের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখিবার একটী বিশেষ কথা হইতেছে এই যে, বেদান্তসূত্রে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—(১) জীবাত্মা অণু, (২) জীবাত্মা হৃদয়ে অবস্থিত এবং (৩) হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়াই এই অণুপরিমিত আত্মা সমগ্রদেহে চেতনা বিস্তৃত করে। এই তিনটী কথার প্রত্যেকটীর পশ্চাতেই শ্রুতির স্পষ্ট সমর্থন আছে। অণুত্বের সমর্থক "এষঃ অণুঃ আত্মা" ইত্যাদি মুণ্ডকোক্তি, "অণুপ্রমাণাৎ"—ইত্যাদি কাঠকোক্তি, "বালাগ্রশতভাগস্য"-ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরোক্তির কথা, হৃদয়ে অবস্থিতি সম্বন্ধে—"হৃদি হি এষ আত্মা"-ইত্যাদি প্রশ্নোপনিষদুক্তি, "স বা এষ আত্মা হৃদি"—ইত্যাদি ছান্দোগ্যোক্তির কথা এবং সমগ্রদেহে চেতনার ব্যাপ্তি সম্বন্ধে "আলোমভ্য আনখাগ্রেভ্যঃ"—ইত্যাদি ছান্দোগ্যোক্তির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ॥"—এই বেদান্তসূত্রানুসারে এই সমস্ত

শ্রুতিবাক্যের মর্ম্ম আমাদের সাধারণ-বুদ্ধির অগোচর হইলেও গ্রহণীয়। তথাপি, হৃদয়ে থাকিয়া অণুপরিমিত জীবাত্মা কিরূপে সমগ্র দেহে তাহার চেতনা বিস্তার করে, তাহা বুঝাইবার জন্য ব্যাসদেব চন্দন, আলোক ও গন্ধের দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। উল্লিখিত আলোচনায় দেখা গিয়াছে—শ্রীপাদ শঙ্কর এই দৃষ্টান্তগুলিরই (আলোকের এবং গন্ধের দৃষ্টান্তেরই) অসঙ্গতি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তর্কের খাতিরে যদি স্বীকারও করা যায় যে, দৃষ্টান্তগুলির সঙ্গতি নাই, তাহা হইলেও, যে কথাটী বুঝাইবার জন্য ব্যাসদেব এই দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা (সমগ্রদেহে চৈতন্যের ব্যাপ্তির কথা) মিথ্যা হইয়া যাইবে না। দৃষ্টান্তের অসঙ্গতিতে দার্ষ্ট্যান্তিক মিথ্যা হইয়া যাইবে না। কাহারও আঙ্গুল খুব বেশী রকম ফুলিয়া গেলে আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি, "আঙ্গুল ফুলিয়া যেন কলাগাছ হইয়াছে।" এখন কেহ যদি আঙ্গুল ও কলাগাছের স্বরূপ, গঠন ও ধর্ম্মাদির আলোচনা করিয়া বলেন যে কলাগাছের দৃষ্টান্ত খাটেনা, আঙ্গুল ফুলিয়া কখনও কলাগাছের মতন হইতে পারে না—তাহা হইলে আঙ্গুল ফুলার কথাটা মিথ্যা হইয়া যাইবে না।

শ্রুতিতে অবশ্য আত্মার বিভুত্বের কথাও আছে। তৎসম্বন্ধে ব্যাসদেব "ন অণুঃ অতচ্ছ্রুতেঃ ইতিচেৎ ন ইতরাধিকারাৎ॥ ২।৩।২১॥"—সূত্রে বলিয়াছেন,—শ্রুতিতে আত্মার বিভুত্বের কথা দৃষ্ট হয়, সত্য; কিন্তু সেই বিভুত্ব জীবাত্মা সম্বন্ধে নহে, পরমাত্মা সম্বন্ধে। এই সূত্রেই ব্যাসদেব জীবাত্মার বিভুত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। এই সূত্রের "ইতরাধিকারাৎ—অন্য আত্মা বিষয়ক বলিয়া"—শব্দ হইতেই বুঝা যায়, ব্যাসদেব দুই আত্মার কথা বলিয়াছেন; এক আত্মা অণু, আর এক আত্মা বিভু। যে আত্মা অণু, তাহাই জীব, আর যে আত্মা বিভু, তাহাই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। সুতরাং জীবের বিভুত্ব স্থাপনের প্রয়াসকে বেদান্তবিরোধী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তথাপি শ্রীপাদ শঙ্কর কেন এরূপ করিয়াছেন, তাহা স্থানান্তরে আলোচিত হইবে।

যাহা হউক, উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—জীবের বিভুত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য আলোচ্য বেদান্তসূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা বিচারসহ নহে এবং তদুপলক্ষে তিনি যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তৎসমস্তও বিচারসহ নহে।

সুতরাং জীবাত্মার অণুত্বই বেদান্তসম্মত।

জীবের অণুত্ব পরিমাণগত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য"-ইত্যাদি শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া তাহার প্রত্যেক ভাগকে আবার শতভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগের যে পরিমাণ হয়, তাহাই জীবের পরিমাণ। এই শ্রুতিতে স্পষ্টভাবেই পরিমাণগত সূক্ষ্মত্বের কথা বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও পরিমাণগত সূক্ষ্মত্বের কথাই জানা যায়। ভগবান্ বলিয়াছেন—"মহতাঞ্চ মহানহম্। সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ॥ ১১।১৬।১১॥—বৃহৎ পরিমাণবিশিষ্টদের মধ্যে আমি মহত্তত্ত্ব এবং সূক্ষ্ম (বা ক্ষুদ্র) পরিমাণবিশিষ্টদের মধ্যে আমি জীব। "তস্মাৎ সূক্ষ্মতাপরাকাষ্ঠাং প্রাপ্তো জীবঃ। দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ যৎ সূক্ষ্মত্বং তদত্র ন বিবক্ষিতং মহতাঞ্চ মহানহং সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীব ইতি পরস্পরপ্রতিযোগিত্বেন বাক্যদ্বয়স্যান্তর্য্যোক্তৌ স্বারস্যভঙ্গাৎ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ॥ ৩৪॥" কাঠকোপনিষদের "অণুপ্রমাণাৎ। ১।২।৮।"-উক্তিও জীবাত্মার পরিমাণগত সূক্ষ্মত্বের প্রমাণই দিতেছে। এইরূপে পরিমাণগত অণুত্বই যখন স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে, তখন ঔপচারিক বা দুর্জ্ঞেয়ত্ববশতঃ অণুত্বের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

জীব চিৎ-কণ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জীবশক্তি চিদ্রূপা। ইহাও বলা হইয়াছে—জীবশক্তিযুক্ত ব্রহ্মের বা কৃষ্ণের অংশই জীব। ব্রহ্ম বা কৃষ্ণও চিদ্বস্তু। সুতরাং জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণও চিদ্বস্তু এবং তাঁহার অংশ জীবও চিদ্বস্তু। সুতরাং জীব হইল ব্রহ্মের চিদংশ। জীবের পরিমাণ অণু বা কণা। সুতরাং জীব হইল ব্রহ্মের চিৎ-কণ অংশ। ব্রহ্ম বা কৃষ্ণ হইলেন বিভু-চিৎ; আর জীব হইল অণু-চিৎ। ভগবানের স্বাংশ-ভগবৎ-স্বরূপগণ প্রত্যেকেই বিভু-চিৎ;—যেহেতু তাঁহারা প্রত্যেকেই "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু। সর্ব্বে পূর্ণাঃ শাশ্বতাশ্চ।" আর তাঁহার বিভিন্নাংশ জীব হইল অণু-চিৎ।

জীবের নিত্যত্ব। যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার বিনাশও আছে; সুতরাং তাহা নিত্য হইতে পারে না। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে আমরা দেখি, মনুষ্য-পশু-পক্ষী আদি জীবের জন্মও আছে, মৃত্যুও আছে। জীবাত্মারও কি তদ্রূপ উৎপত্তি-বিনাশ আছে? জীবাত্মার কি উৎপত্তি হয়? ইহার উত্তরে বেদান্তসূত্রে ব্যাসদেব বলিতেছেন:—

"ন আত্মা শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চতাভ্যঃ॥ ২।৩।১৭॥"—"আত্মা ন"—জীবাত্মা উৎপন্ন হয় না, জন্মে না। "শ্রুতেঃ"—শ্রুতি তাই বলেন। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ কঠ। ১।২।১৮॥—আত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। ইহা কোনও কারণান্তর হইতে আসে নাই, নিজেও অন্য কিছুর কারণ নহে। এই আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ। শরীর হত হইলে ইহা শরীরের সহিত হত হয় না। জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা ইত্যাদি। শ্বেতাশ্বতর॥ ১।৯॥—সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর এবং অল্পজ্ঞ জীব এবং জীবের ভোগ্যা প্রকৃতি ইহারা সকলেই অজ (জন্মরহিত)।" "নিত্যত্বাৎতাভ্যঃ"—শ্রুতি-স্মৃতি এই উভয় হইতে জীবাত্মার নিত্যত্বের কথা জানা যায়। "চ"—চেতনত্বং চ-শব্দাৎ। চ-শব্দে আত্মার চেতনত্ব বুঝায়। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্ অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণ ইত্যাদ্যাঃ।—নিত্যেরও নিত্য; চেতনেরও চেতন; অজ, নিত্য, শাশ্বত—এই প্রকার শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণ আছে।" (গোবিন্দভাষ্য)।

"এবং সতি জাতো যজ্ঞদত্তো মৃতশ্চেতি যোঽয়ং লৌকিকো ব্যবহারো যশ্চ জাতকর্ম্মাদিবিধিঃ সতু দেহাশ্রিত এব ভবেৎ।—যজ্ঞদত্তের জন্ম হইয়াছে, যজ্ঞদত্তের মৃত্যু হইয়াছে, এই যে লৌকিক ব্যবহার এবং জীবের যে জাতকর্ম্মাদির বিধি—তাহা কেবল দেহাশ্রিত জীবের সম্বন্ধে।" বৃহদারণ্যক-শ্রুতিও বলেন—"স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরম্ অভিসম্পদ্যমানঃ স উৎক্রামন্ ম্রিয়মাণ ইতি।—জীব জন্মসময়ে দেহপ্রাপ্ত হয়, মৃত্যুকালে দেহ হইতে উৎক্রমণ করে।" ছান্দোগ্য-উপনিষৎও বলেন—"জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়ত ইতি।—জীবের মৃত্যু নাই, জীব হইতে বিশ্লিষ্ট দেহেরই ধ্বংস ইত্যাদি।" (গোবিন্দভাষ্য)।

এইরূপে জানা গেল, জীবাত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। জীবাত্মা নিত্য। মায়াবদ্ধ জীবের মায়িক দেহেরই জন্ম ও মৃত্যু।

নিত্য পৃথক্ অস্তিত্ব। জীবের অণুত্ব যখন তাহার স্বরূপগত, তখন তাহা নিত্যও; যেহেতু, কোনও অনিত্য বা আগন্তুক বস্তু স্বরূপের অন্তর্ভূত হইতে পারে না।

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। গী, ১৫।৭॥"-এই গীতাবাক্যেও জীব-স্বরূপকে—সুতরাং জীবের অণুত্বকেও—সনাতন বা নিত্য বলা হইয়াছে।

"অন্ত্যাবস্থিতেঃ চ উভয়নিত্যত্বাৎ অবিশেষঃ॥ ২।২।৩৬॥"-এই বেদান্তসূত্রে বলা হইয়াছে—অন্ত্য বা শেষ অবস্থায় (মোক্ষ লাভের পরে) জীবাত্মা যে ভাবে অবস্থান করে, সে সময় আত্মা এবং আত্মার পরিমাণ এই উভয় পদার্থের নিত্যত্ব হেতু "অবিশেষঃ"—মোক্ষের পূর্ব্বে ও পরে জীবাত্মার পরিমাণে কোনও পার্থক্য হইতে পারে না। এই সূত্র হইতে জানা যায়, মোক্ষের পরেও আত্মা অণুপরিমিতই থাকে।

জীবের এই অণুত্ব যখন নিত্য এবং মোক্ষপ্রাপ্তির পরেও যখন আত্মা অণুপরিমিতই থাকে, তখন সহজেই বুঝা যায়, জীবাত্মা কখনও বিভু হইতে পারে না। প্রশ্ন হইতে পারে, সাযুজ্য-মুক্তিতে জীব যখন ব্রহ্মের সঙ্গে লয় প্রাপ্ত হয়, তখনও কি বিভুত্ব প্রাপ্ত হয় না? উত্তরে বলা যায়—না, তখনও বিভুত্ব প্রাপ্ত হয় না; যেহেতু জীবাত্মা স্বরূপেই অণু; কোনও অবস্থাতেই বস্তুর স্বরূপের ধর্ম্ম নষ্ট হয় না। শঙ্করাচার্য্যের মতে মায়া-কবলিত ব্রহ্মই জীব; মায়ামুক্ত হইলেই জীব ব্রহ্ম হইয়া যায়, তখন বিভুত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই মত যে বিচারসহ নয়, পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া কখনও মায়ার অজ্ঞানদ্বারা কবলিত হইতে পারেন না; হইতে পারিলে ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপত্বই থাকে না। সাযুজ্যমুক্তিতে জীব ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্যমাত্র প্রাপ্ত হয়, তাহাতে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। ব্রহ্মানন্দরূপ মহাসমুদ্রে ক্ষুদ্র আনন্দ-কণিকার ন্যায় অবস্থিত থাকে। বহুবিস্তীর্ণ জ্বলদগ্নিরাশির মধ্যে ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড যেমন অগ্নি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া অগ্নির আকার ধারণ পূর্ব্বকই

স্বীয় পৃথক্ অস্তিত্ব রক্ষা করে, তদ্রূপ। মুক্তাবস্থায়ও জীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথা শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার নৃসিংহতাপনী-ভাষ্যে (২।৫।১৬১) স্বীকার করিয়াছেন। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥—মুক্ত জীবগণও ভক্তির কৃপায় দেহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন।" দেহ-ধারণ-রূপ কার্য্যটী ভক্তির কৃপায় হইতে পারে; কিন্তু মুক্তাবস্থায় জীবের পৃথক্ অস্তিত্বই যদি না থাকে, দেহ-ধারণ করিবে কে? শঙ্করাচার্য্যের উল্লিখিত উক্তিদ্বারাই মুক্তাবস্থায়ও জীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথা জানা যায়। শ্রুতির উক্তি হইতেও মুক্তপুরুষদিগের ভজনের কথা—সুতরাং তাঁহাদের পৃথক্ অস্তিত্বের কথা—জানা যায়। "মুক্তা অপি হি এনম্ উপাসতে। সৌপর্ণশ্রুতিঃ॥" ব্রহ্মসূত্রেও মুক্তপুরুষদিগের ভজনের কথা দৃষ্ট হয়। "আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্॥ ব্র, সূ, ৪।১।১২॥ (এই সূত্রের ব্যাখ্যা ১।৭।৮১ পয়ারের টীকায় আদিলালার ৫২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।" "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী-ভবতি।"-এই শ্রুতিবাক্য হইতেও মুক্তাবস্থায় জীবের পৃথক অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এই শ্রুতিবাক্য বলেন—রসস্বরূপ ব্রহ্মকে পাইলেই জীব আনন্দী হইতে পারে। মুক্তাবস্থাতেই রস-স্বরূপ ব্রহ্মকে পাইতে পারা যায়, তৎপূর্ব্বে নহে। তাঁহাকে পাইলে জীব আনন্দী হয়, একথাই শ্রুতি বলিয়াছেন; আনন্দ হয়—একথা বলেন নাই। আনন্দ এক বস্তু, আনন্দী আর এক বস্তু; যেমন ধন এবং ধনী দুই বস্তু। সুতরাং "আনন্দী"-শব্দেই মুক্তজীবের পৃথক্ অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে।

বিষ্ণুপুরাণের "বিভেদজনকেঽজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে। আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি॥" এই ৬।৭।৯৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে মুক্তজীবেরও পৃথক্ অস্তিত্বের কথা বলিয়াছেন। "দেবত্ব-মনুষ্যত্বাদিলক্ষণো বিশেষতো যো ভেদস্তস্য জনকেঽপি অজ্ঞানে নাশং গতে, ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ সকাশাৎ আত্মনো জীবস্য যো ভেদঃ স্বাভাবিকঃ তং ভেদং অসন্তং কঃ করিষ্যতি? অপিতু সন্তং বিদ্যমানমেব সর্ব্বঃ করিষ্যতীত্যর্থঃ। * * * মোক্ষদশায়ামপি তদংশত্বাব্যভিচারঃ স্বাভাবিকশক্তিত্বাদেব॥ ২৬॥" পরমাত্মসন্দর্ভের অন্যত্রও তিনি বলিয়াছেন—"দেবমনুষ্যাদিনামরূপ-পরিত্যাগেন তস্মিন্ লীনেঽপি স্বরূপভেদোঽস্ত্যেব তত্তদংশসদ্ভাবাৎ॥"

উল্লিখিত প্রমাণাদি হইতে জানা গেল, মুক্তজীবেরও পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে।

জীব সংখ্যায় অনন্ত। "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য তু। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥"-এই শ্রুতিবাক্যের অন্তর্গত "আনন্ত্য"-শব্দের অর্থ যে শ্রীজীবগোস্বামী "অনন্ত-সংখ্যা" করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৪৪।)। সুতরাং এই শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা যায়, জীবের সংখ্যা অনন্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতের "অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতাস্তর্হি ন শাস্যতেতি।" ইত্যাদি ১০।৮৭।৩০ শ্লোকের টীকায় তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন "অপরিমিতা বস্তুত এব অনন্তসংখ্যা নিত্যাশ্চ যে তনুভৃতো জীবাস্তে" ইত্যাদি। ৩৫।—জীবের সংখ্যা অনন্ত এবং জীব নিত্য।" উক্ত শ্লোকের শ্রীধরস্বামীর টীকা হইতেও ঐরূপ অর্থই জানা যায়। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতও বলিতেছেন—জীবের সংখ্যা অনন্ত।

জীবের স্বরূপগত অণুত্ব হইতেও তাহার সংখ্যার অনন্তত্ব সূচিত হইতেছে। এই ব্রহ্মাণ্ডে আমরা অনন্ত কোটী দেহধারী জীব দেখিতেছি। তাহাদের প্রত্যেকের হৃদয়েই অণুরূপে জীবাত্মা বিদ্যমান। অনন্তকোটী দেহে অনন্তকোটী জীবাত্মা। সুতরাং জীবাত্মার সংখ্যাও অনন্ত।

জীব জ্ঞানস্বরূপ এবং জ্ঞাতা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জীব চিদ্রূপ—চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতা, বেদান্ত-সূত্রও তাহাই বলেন—"জ্ঞঃ অতএব॥২।৩।১৮॥—জীব হইল 'জ্ঞঃ' অর্থাৎ জ্ঞাতা॥" এসম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ এই। "অথ যো বেদ ইদং জিঘ্রাণি ইতি স আত্মা—যিনি জানেন, ইহা আঘ্রাণ করিতেছি, তিনি আত্মা। ছান্দোগ্য।" প্রশ্নোপনিষদও বলেন—"এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ॥ ৪।৯।—এই জীবই দ্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা রসয়িতা, বোদ্ধা, কর্ত্তা ও বিজ্ঞানাত্মা।"

পরমাত্মসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামীও বলিয়াছেন—"জ্ঞানমাত্রাত্মকো ন চেতি। কিং তর্হি জ্ঞানমাত্রত্বেঽপি জ্ঞাতৃত্বং প্রকাশবস্তুনঃ প্রকাশমাত্রত্বেঽপি প্রকাশমানত্ববৎ।—সারার্থ জ্ঞানমাত্রেই জ্ঞাতৃত্ব জানিতে হইবে।"

জীবাত্মা অণুচিৎ বলিয়া তাহার জ্ঞানও অবশ্য স্বল্প। জীব স্বল্পজ্ঞ। বিভুচিৎ বলিয়া ব্রহ্ম কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ।

জীবের কর্ত্তৃত্ব আছে। "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥২।৩।৩৩॥"—এই বেদান্তসূত্র হইতে জানা যায়, জীবের কর্ত্তৃত্ব আছে। গোবিন্দভাষ্য বলেন—"জীব এব কর্ত্তা ন গুণাঃ। কুতঃ শাস্ত্রেতি। স্বর্গকামো যজেতাত্মানমেব লোক-মুপাসীতেত্যাদিশাস্ত্রস্য চেতনে কর্ত্তরি সার্থক্যাৎ গুণকর্ত্তৃত্বেন তদনর্থকং স্যাৎ। শাস্ত্রং কিল ফলহেতুতাবুদ্ধিমুৎপাদ্য কর্ম্মসু তৎফলভোক্তারং পুরুষং প্রবর্ত্তয়তে। ন চ তদ্বুদ্ধির্জড়ানাং গুণানাং শক্যোৎপাদয়িতুম্।—জীবই কর্ত্তা, মায়িকগুণ কর্ত্তা নহে। স্বর্গকাম ব্যক্তি যজ্ঞ করিবেন—ইত্যাদি শাস্ত্র-বাক্যের সার্থকতা চেতন কর্ত্তাতেই দেখা যায়। গুণের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে উক্ত শাস্ত্রবাক্যের নিরর্থকতা ঘটে। যেহেতু, শাস্ত্র—কর্ম্মই ফলের হেতু এইরূপ বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া ফলভোগাকাঙ্ক্ষী জীবকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। জড়মায়ার জড়গুণে তদ্রূপ বুদ্ধির উৎপাদন সম্ভব নয়। জীবই শাস্ত্রার্থ বুঝিতে পারে, জড়গুণ তাহা পারে না।" তাই জীবই কর্ত্তা, মায়িক গুণ নহে।

যদি কেহ প্রশ্ন করেন, জীবই যদি বাস্তবিক কর্ত্তা হয়, গুণ বা প্রকৃতি যদি কর্ত্তা না হয়, তাহা হইলে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কেন বলিলেন—প্রকৃতির গুণই সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকে; ভ্রম বশতঃ মায়াবদ্ধজীব নিজেকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" ইহার উত্তরে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য বলেন—উল্লিখিত গীতোক্তির তাৎপর্য্য এই যে, সাংসারিক কর্ম্ম করিবার সময়ে মায়ামুগ্ধ জীব সত্ত্ব, রজঃ বা তমঃ গুণের নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করে।

আলোচ্য বেদান্তসূত্রে শুদ্ধজীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তৃত্বের কথাই বলা হইয়াছে। আর উদ্ধৃত গীতাশ্লোকে বলা হইয়াছে—মায়াবদ্ধ জীবের কথা। শুদ্ধজীব অনাদিকর্ম্মফলবশতঃ যখন প্রাকৃত জগতের সুখভোগের আশায় প্রাকৃত জগতের অধিষ্ঠাত্রী-মায়ার নিকটে আত্মসমর্পণ করে, তখনই মায়ার কবলে পড়িয়া যায়, মায়িক গুণরাগে রঞ্জিত হইয়া যায়। ভূতে-পাওয়া মানুষ যাহা কিছু করে বা বলে, তৎসমস্ত যেমন বাস্তবিক তাহার নিজের কাজ বা কথা নয়, ভূতেরই কাজ বা কথা, লোকটীর শক্তিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইতেছে মাত্র; তদ্রূপ মায়ার গুণরাগে রঞ্জিত মায়াবিষ্ট জীবও যাহা কিছু করে, তাহা বাস্তবিক মায়ার বা মায়াগুণের প্রেরণাতেই করিয়া থাকে; কিন্তু মায়ামুগ্ধত্ববশতঃ জীব তাহা বুঝিতে পারে না বলিয়া মনে করে—সে নিজের কর্ত্তৃত্বের স্বাধীন-পরিচালনাতেই তাহা করিতেছে। কর্ত্তৃত্ব-শক্তি অবশ্য জীবেরই; কিন্তু তাহা পরিচালিত হয় মায়াদ্বারা। সুতরাং উদ্ধৃত গীতাশ্লোকে জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তৃত্ব নিষিদ্ধ হইতেছে না।

পরবর্ত্তী "বিহারোপদেশাৎ॥ ২।৩।৩৪॥, উপাদানাৎ॥ ২।৩।৩৫॥, ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ॥ ২।৩।৩৬॥, উপলব্ধিবদনিয়মঃ॥ ২।৩।৩৭॥, শক্তিবিপর্য্যয়াৎ॥ ২।৩।৩৮॥, সমাধ্যভাবাচ্চ॥ ২।৩।৩৯॥, এবং, যথা চ তক্ষোভয়থা॥ ২।৩।৪০॥"-বেদান্তসূত্রসমূহেও ব্যাসদেব জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তৃত্বকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

জীবের কর্ত্তৃত্ব পরমেশ্বরাধীন। কিন্তু জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বাধীন নহে; পরন্তু পরমেশ্বরের কর্ত্তৃত্বের অধীন। "এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যো উন্নীনিষতে এষ হ্যেবসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে।—পরমেশ্বর যাহাকে ইহলোক হইতে উচ্চ লোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদ্বারা তিনি সাধুকর্ম্ম করান এবং যাহাকে অধোগামী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদ্বারা অসাধু কর্ম্ম করান। অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানমন্তরো যময়তি এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি।—সেই শাস্তা পরমেশ্বর জীবসমূহের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের দ্বারা সাধুকর্ম্ম করাইয়া থাকেন।"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, জীবের কর্ত্তৃত্ব পরমেশ্বরের অধীন। তাই, "পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেঃ॥ ২।৩।৪১॥"-এই বেদান্তসূত্রে ব্যাসদেব বলিতেছেন—শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, জীবের কর্ত্তৃত্ব পরমেশ্বর হইতেই প্রবর্ত্তিত হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, জীবের কর্তৃত্ব যদি ঈশ্বরাধীনই হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধের সার্থকতা থাকে কিরূপে? যেহেতু, যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছানুসারেই কোনও কাজ করিতে বা না করিতে সমর্থ, তাহার জন্যই বিধি-নিষেধ। পূর্ব্বসূত্রোপলক্ষ্যেও বলা হইয়াছে, পরমেশ্বর যাহাকে উচ্চলোকে নিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদ্বারা সাধু কার্য্য করান এবং যাহাকে অধোগামী করিতে চাহেন, তাহাদ্বারা অসাধু কার্য্য করান। ইহাতে কি পরমেশ্বরের পক্ষপাতিত্ব ও নিষ্ঠুরত্ব প্রমাণিত হইতেছে না? এই প্রশ্নের উত্তর রূপেই ব্যাসদেব পরবর্ত্তী সূত্রে বলিতেছেন,—

"কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ॥ ২।৩।৪২॥"—জীবকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণ প্রযত্ন অনুসারেই পরমেশ্বর জীবের দ্বারা কার্য্য করাইয়া থাকেন; সুতরাং বিধি-নিষেধের ব্যর্থতার কথা উঠে না। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের পার্থক্য হইতেই ফলের পার্থক্য। এই ফলপার্থক্যের জন্য পরমেশ্বর দায়ী নহেন; দায়ী জীব; কারণ জীবের হৃদয়েই ধর্ম্মের বা অধর্ম্মের ভাব বিদ্যমান; এবং তদনুসারেই তাহার প্রয়াস। সেই প্রয়াস অনুসারেই ঈশ্বর জীবের কর্তৃত্বকে প্রবর্ত্তিত করেন। শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ ভাষ্যকারগণ মেঘের দৃষ্টান্ত দিয়া বিষয়টী বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন বীজ হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বৃক্ষাদির উৎপত্তি হয়; তাহাদের আবার, ফুল, ফল, স্বাদ, গুণ প্রভৃতি সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু কেবল বীজ থাকিলেই এসকল বৃক্ষ জন্মিতে পারে না, তাহাদের ফুল-ফলাদিও জন্মিতে পারে না। তজ্জন্য প্রয়োজন বৃষ্টির। মেঘ বারিবর্ষণ করে—সাধারণভাবে সকল জাতীয় বীজের বা বৃক্ষের উপরে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বীজের বা বৃক্ষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের বৃষ্টি হয় না। এক রকম বৃষ্টির জল হইতেই ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ফুল-ফলাদি জন্মে। বৃক্ষসকলের এবং তাহাদের ফুল-ফলাদির বিভিন্নতার হেতু হইল বীজ। আবার কেবল বীজ হইলেও বৃক্ষাদি জন্মেনা, বৃষ্টির অপেক্ষা আছে। বৃষ্টি হইলেও বৃক্ষাদি জন্মিবে না, যদি বীজ না থাকে। তদ্রূপ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মের ফলে মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তে যে কর্ম্মের বাসনা জন্মে, সেই বাসনা অনুসারে জীব যে কর্ম্মের জন্য প্রয়াসী হয়, সেই কর্ম্ম করার ক্ষমতামাত্র পরমেশ্বর তাহাকে দেন—মেঘ যেমন জল দান করিয়া বীজকে অঙ্কুরিত এবং পরিপুষ্ট করে, তদ্রূপ। বীজের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে বৃক্ষ, বৃক্ষের ফুল-ফলাদি আছে। বৃষ্টির জলে তাহারা বিকাশ লাভ করে। তদ্রূপ জীবের প্রয়াস বা প্রয়াসেরও মূল যে ইচ্ছা, তাহার মধ্যেই জীবের কর্ম্মাদি সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান। সেই ইচ্ছা কার্য্যরূপে বিকাশলাভ করে কেবল পরমেশ্বরের শক্তিতে। জীব কাষ্ঠ-লোষ্ট্রাদির ন্যায় ইচ্ছা-প্রয়াসাদিহীন বস্তু নহে; যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে জীবের সমস্ত কর্ম্মের জন্য পরমেশ্বরই দায়ী হইতেন। কিন্তু তাহা নয়। "যদি বিধৌ নিষেধেচ পরেশ এব কাষ্ঠ-লোষ্ট্রতুল্যং জীবং নিযুঞ্জ্যাৎ তর্হি তস্য বাক্যস্য প্রামাণ্যং হীয়েত। গোবিন্দভাষ্য।" ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কর্ম্ম করে বলিয়া জীবের যে কোনও কর্তৃত্ব নাই, তাহা নহে। "কর্ত্তাপি পরপ্রেরিতঃ করোতীতি কর্তৃত্বং জীবস্য ন নিবার্য্যতে॥ গোবিন্দভাষ্য।" জীব হইল প্রযোজ্য কর্ত্তা, আর পরমেশ্বর হইলেন প্রযোজক কর্ত্তা। "তস্মাৎ স জীবঃ প্রযোজ্যকর্ত্তা পরেশস্তু হেতুকর্ত্তা। গোবিন্দভাষ্য।" বৃষ্টির জল ব্যতীত যেমন বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না, তদ্রূপ ঈশ্বরের শক্তি ব্যতীতও জীব কোনও কাজ করিতে পারে না। "তদনুমতিমন্তরা অসৌ কর্ত্তুং ন শক্নোতি। গোবিন্দভাষ্য।"

কাজ করার শক্তিমাত্র দেন পরমেশ্বর। সেই শক্তির পরিচালনাদ্বারা জীব তাহার ইচ্ছানুসারে কাজ করে। তাই কর্ম্মফলের জন্য ঈশ্বর দায়ী হন না, জীবই দায়ী হয়। "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্।"

যাহা হউক, পরমেশ্বর যে জীবের প্রযত্নের বা ইচ্ছার অপেক্ষা রাখেন (কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু), বিধিনিষেধাদির অব্যর্থতাই (বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ) তাহার প্রমাণ। পরমেশ্বরের কর্তৃত্বে (অর্থাৎ তাঁহার নিকট হইতে শক্তি পাইয়া) জীব বিধিনিষেধের পালন করে, এবং তদনুরূপ ফল পাইয়া থাকে—বিধির পালনে বিধিপালনের ফল এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়া নিষিদ্ধ কর্ম্মেরই ফল পায়। কখনও পরমেশ্বর বিধিপালনকারীকে অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানকারীকে অধর্ম্মের ফল দেন না এবং অধর্ম্মানুষ্ঠানকারীকেও ধর্ম্মের ফল দেন না। যদি তাহাই দিতেন, তাহা হইলে বিধি-নিষেধের ব্যর্থতা জন্মিত। কিন্তু তাহা হয় না। বৃষ্টির ফলে আমের বীজ হইতে বটগাছ জন্মেনা, বটের বীজ হইতেও

কাঁঠালগাছ জন্মেনা। বীজ-অনুরূপ গাছই জন্মে। গাছের বিশেষত্বের হেতু হইল বীজ, বৃষ্টি বীজকে অঙ্কুরিত করে মাত্র। তদ্রূপ, জীবের কর্ম্মের বিভিন্নতার হেতু হইল তাহার ইচ্ছা বা প্রয়াস। ঈশ্বরের শক্তি ইচ্ছানুগত-প্রয়াসে জীবকে প্রবর্ত্তিত করে মাত্র। ঈশ্বর-প্রবর্ত্তিত জীব ইচ্ছানুরূপভাবে নিজের কর্ত্তৃত্বের পরিচালনা করিয়া যে কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্মের ফলই পায়, অন্যরূপ ফল পায় না। বড় বড় সহরে তারযোগে বৈদ্যুতিক শক্তি সর্ব্বত্রই সরবরাহ হয়; নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে কেহ তদ্দ্বারা আলো জ্বালে, কেহ পাখা চালায়, কেহ জল তোলে, কেহ কোনও যন্ত্র চালায়। যাঁর বাড়ীতে বৈদ্যুতিক-শক্তিযোগে কেবল আলো জ্বালিবার বন্দোবস্তই আছে, অন্য কোনও বন্দোবস্ত নাই, তাঁর বাড়ীতে ঐ শক্তি কেবল আলোই জ্বালিবে, পাখা বা যন্ত্রাদি চালাইবে না। জীবের পক্ষে ঈশ্বরের শক্তি হইল বিদ্যুতের তুল্য, আর তার বিভিন্ন কর্ম্ম হইল—আলো, পাখাচালান-আদি বৈদ্যুতিক শক্তির বিভিন্ন কার্য্যের তুল্য। সূত্রস্থ "আদি"-শব্দে পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ও নিগ্রহ সূচিত হইতেছে। সাধুকর্ম্মে প্রবর্ত্তনই অনুগ্রহ এবং অসাধুকর্ম্মে প্রবর্ত্তনই নিগ্রহ। এই অনুগ্রহ বা নিগ্রহের মূল পরমেশ্বরের ইচ্ছা নয়—ইহা জীবের ইচ্ছা বা প্রযত্ন। জীব যেরূপ ইচ্ছা করে বা প্রযত্ন করে, সেরূপ কর্ম্মই করে, কর্ম্ম করার শক্তিটী মাত্র পরমেশ্বর দেন। পর্ব্বত হইতে নদীরূপে জল আসে, জীব সেই জল যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করে। তদ্রূপ, সমস্ত শক্তির উৎস পরমেশ্বর হইতে জীব শক্তি পায়, সেই শক্তিকে জীব তাহার ইচ্ছানুরূপভাবে ব্যবহার করে। ব্যবহারের দায়িত্ব এবং ফল জীবের—পরমেশ্বরের নহে। নদীর জলে কেহ তৃষ্ণা নিবারণ করে, কেহ আহার্য্য প্রস্তুত করে, কেহ বা নিজে ডুবিয়া মরে বা অপরকে ডুবাইয়া মারে; এসমস্ত কার্য্যের দায়িত্ব নদীর বা পর্ব্বতের নহে, এসমস্ত কার্য্যের ফলও নদী বা পর্ব্বত ভোগ করে না।

যাহা হউক, পরমেশ্বর অন্তর্য্যামিরূপে সকল জীবের চিত্তেই বিদ্যমান্। অন্তর্য্যামিরূপেই তিনি জীবকে স্বস্ব-প্রযত্নানুরূপ বা ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন। একথাই "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥ গীতা। ১৮।৬১॥"—এই শ্লোকে অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিয়াছেন।

জীবের অণুস্বাতন্ত্র্য। উল্লিখিত আলোচনা ইহতে জানা গেল—ঈশ্বর হইলেন প্রবর্ত্তক কর্ত্তা বা প্রযোজক কর্ত্তা; আর জীব হইল প্রবর্ত্তিত কর্ত্তা বা প্রযোজ্যকর্ত্তা। জীবের কর্ত্তৃত্ব পরমেশ্বরের অধীন; পরমেশ্বরের শক্তি না পাইলে জীব নিজের কর্ত্তৃত্বকে বিকাশ করিতে পারেনা। পরমেশ্বরের শক্তিতে নিজের কর্ত্তৃত্ব-বিকাশের ফলে জীবের যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার দায়িত্ব জীবেরই, ঈশ্বরের নহে; এবং ফলভোক্তাও জীবই, ঈশ্বর নহেন। ঈশ্বর কর্ম্মফলের দাতা মাত্র। জীবের দায়িত্বের হেতু এই যে—জীব নিজের ইচ্ছানুসারেই ঈশ্বর-প্রদত্ত শক্তিকে ব্যবহার করিয়া কর্ম্ম করে। জীব ভগবানের চিৎ-কণ অংশ। ভগবান্ পরম-স্বতন্ত্র। অংশীর ধর্ম্ম অংশেও কিছু থাকে। অতি সামান্য হইলেও স্ফুলিঙ্গে অগ্নির দাহিকা শক্তি থাকে। ভগবানের অংশস্বরূপ জীবেও সামান্য কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। ভগবান্ বিভু, তাঁহার স্বাতন্ত্র্যও বিভু। কিন্তু জীব অণু; জীবের স্বাতন্ত্র্যও অণু। জীব ভগবান্ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত বলিয়া তাহার অণুস্বাতন্ত্র্যও ভগবানের বিভু-স্বাতন্ত্র্যদ্বারা অবস্থাবিশেষে নিয়ন্ত্রণের যোগ্য। একটা গরুকে যদি দড়ি দিয়া কোনও খুঁটার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে দড়ি যতদূর পর্য্যন্ত যাইবে, ততদূর স্থানের মধ্যে গরুটী যথেচ্ছভাবে চরিয়া বেড়াইতে পারে; কিন্তু দড়ির বাহিরে যাইতে পারেনা। দড়ির গণ্ডীর মধ্যে গরুটীর চলাফেরা সম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্য আছে। ইহা সীমাবদ্ধ স্বাতন্ত্র্য। জীবের অণুস্বাতন্ত্র্যও এইরূপ সীমাবদ্ধ। জীবের এই অণুস্বাতন্ত্র্যের বিকাশও কেবল তাহার ইচ্ছাতে। জীব যে কোনও ইচ্ছাই হৃদয়ে পোষণ করিতে পারে —ইহাই মাত্র জীবের স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু যে কোনও ইচ্ছানুরূপ কাজ করার শক্তি জীবের নাই; তদনুরূপ শক্তিও জীব পরমেশ্বর হইতে পাইতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা জীবের জন্মিলেও সৃষ্টি কিন্তু করিতে পারে না। এসকল স্থলেই জীবের স্বাতন্ত্র্যের অণুত্ব বুঝা যায়। "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্"-বাক্য হইতেই জীবের অণুস্বাতন্ত্র্য প্রমাণিত হয়। কর্ম্মকরণে জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছা না থাকিলে কর্ম্মের জন্য জীব দায়ী হইতে পারেনা

এবং সেই কর্ম্মের ফলও জীবের ভোগ্য হইতে পারে না। এই অণুস্বাতন্ত্র্য আছে বলিয়াই ঈশ্বর-প্রদত্ত কর্ম্ম-শক্তিকে জীব যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিতে পারে এবং যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিতে পারে বলিয়াই কর্ম্মফলের দায়িত্ব জীবের।

জীব কৃষ্ণের ভেদাভেদ প্রকাশ। শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদবাচক বাক্য যেমন আছে, অভেদবাচক বাক্যও তেমনি আছে। এমন কি একই শ্রুতিতেও ভেদবাচক এবং অভেদবাচক বাক্য দৃষ্ট হয়। যেমন, ছান্দোগ্য উপনিষদে। "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো। —হে শ্বেতকেতো! তাহাই তুমি (অর্থাৎ ব্রহ্মই তুমি)। ৬।৮।৭॥"; ইহা অভেদ-বাচক বাক্য। আবার ভেদবাচক বাক্যও ছান্দোগ্যে দৃষ্ট হয়। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।—সকলই ব্রহ্ম; (যে হেতু) তাঁহা হইতে উৎপত্তি, তাঁহাতে স্থিতি এবং তাঁহাতেই লয়। শান্ত চিত্তে তাঁহার উপাসনা করিবে। ৩।১৪।১॥" এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। উপাসনা বলিলেই উপাস্য এবং উপাসক—এই দুইকে বুঝায়। ব্রহ্ম উপাস্য, জীব তাঁহার উপাসক। সুতরাং এই শ্রুতিবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথাই পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যকেও ভেদবাচক এবং অভেদ-বাচক বাক্য দৃষ্ট হয়। "অহং ব্রহ্মাস্মি।—আমি ব্রহ্ম হই।" ইহা বৃহদারণ্যকের অভেদবাচক বাক্য। "য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মি ইতি—স ইদং সর্ব্বং ভবতি।—যিনি জানেন, আমি ব্রহ্ম, তিনি সব হন। বৃ, আ, ২।৪।১০॥" আবার ভেদবাচক শ্রুতিও আছে। "স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।—যেরূপ উর্ণনাভ তন্তু বিস্তার করে, যেরূপ অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হয়, তদ্রূপ আত্মা হইতে সকল প্রাণী, সকল লোক, সকল দেবতা এবং সকল ভূত সৃষ্ট হইয়াছে। ২।১।২০॥" এই শ্রুতিও জীব ও ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে একরূপতার কথা বলেন না। একই শ্রুতিতে যখন জীব ও ব্রহ্মের ভেদবাচক এবং অভেদ-বাচক বাক্য দৃষ্ট হয় (এবং অন্যান্য বহুশ্রুতিতেও যখন তদ্রূপ বাক্যসকল দৃষ্ট হয়), তখন, জীব ও ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে ভেদ আছে—একথা যেমন বলা চলে না, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে অভেদ আছে—একথাও তেমনি বলা চলে না। ইহার কোনওটাই শ্রুতির অভিপ্রেত হইতে পারে না। তাহা হইলে পরস্পর-বিরোধী বাক্য একই শ্রুতিতে থাকিত না।

ভেদবাচক বাক্যও যেমন শ্রুতির উক্তি, অভেদবাচক বাক্যও তেমনি শ্রুতির উক্তি এবং উভয়-প্রকার বাক্যেই জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধের—তত্ত্বের—কথাই বলা হইয়াছে। শ্রুতির উক্তি বলিয়া উভয় প্রকারের বাক্যই অপৌরুষেয়—সুতরাং তুল্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই উভয় প্রকারের বাক্যেই সমান গুরুত্ব দিয়া তাহাদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিতে হইবে। বাস্তবিক, আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী শ্রুতিবাক্যের সমন্বয়-স্থাপনের উদ্দেশ্যেই ব্যাসদেব বেদান্তসূত্র সঙ্কলিত করিয়াছেন; তাই বেদান্তসূত্রের অপর এক নাম উত্তর-মীমাংসা। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য ভেদবাচক শ্রুতিবাক্যগুলিকে ব্যবহারিক—পারমার্থিক নহে—বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহার এইরূপ উক্তির সমর্থনে তিনি কোনও শ্রুতিবাক্যেরও উল্লেখ করেন নাই। এই ব্যাপারে স্থলবিশেষে তিনি যে শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অবিসংবাদিতভাবে তাঁহার মতেরই সমর্থন করে না; তাঁহার যুক্তির অনুকূল যে ব্যাখ্যা তিনি ঐ শ্রুতিবাক্যে আরোপ করিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যামাত্রই তাঁহার অনুকূলে যায়; কিন্তু সেই ব্যাখ্যায় শ্রুতির মুখ্যার্থ প্রকাশিত হয় না। মুখ্যার্থ অন্যরূপ এবং সমগ্র শ্রুতির সহিত এই মুখ্যার্থের অসঙ্গতিও দৃষ্ট হয় না। মুখ্যার্থের সঙ্গতিস্থলে অন্যরূপ অর্থ শাস্ত্রানুমোদিত নহে। ভেদবাচক শ্রুতিবাক্যগুলি যে ব্যবহারিক, পারমার্থিক নয়, ইহা শ্রীপাদশঙ্করের ব্যক্তিগত অভিমতমাত্র; ইহার সমর্থক কোনও শ্রুতিবাক্য নাই। তাই শ্রুতিপ্রতিষ্ঠিত বিচারে ইহার কোনও মূল্য থাকিতে পারে না।

যাহা হউক, এই আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী শ্রুতিবাক্যগুলির সমন্বয়ের একটীমাত্র পন্থা আছে; তাহা হইতেছে—উভয়কে তুল্যরূপে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা, উভয়কেই পারমার্থিক তত্ত্বনির্ণায়ক মনে করা। শ্রীপাদ-শঙ্কর তাহা করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন—জীবে ও ব্রহ্মে ভেদও আছে,

অভেদও আছে; এই উভয় সম্বন্ধই তুল্যরূপে সত্য। প্রকৃত সম্বন্ধ হইল ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। তাই প্রভু বলিয়াছেন, জীব হইল—"কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥ ২।২০।১০১॥"

বেদান্তসূত্রকার ব্যাসদেবও ভেদাভেদ-তত্ত্বই স্থাপন করিয়া উভয় প্রকার শ্রুতিবাক্যের সমান মর্য্যাদা দিয়াছেন। কয়েকটী বেদান্তসূত্রের উল্লেখপূর্ব্বক নিম্নে তাহা দেখান হইতেছে।

"উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ॥ ৩।২।২৭॥"—উভয়ব্যপদেশাৎ (জীব ও ব্রহ্মে ভেদ এবং অভেদ এই উভয় প্রকার উল্লেখ আছে বলিয়া) অহিকুণ্ডলবৎ (সর্প ও তাহার কুণ্ডলের অনুরূপ বলা যাইতে পারে)। সাপ যদি কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকে, তাহা হইলে সাপ ও কুণ্ডলী স্বরূপতঃ উভয়েই সাপ; এই হিসাবে তাহাদের মধ্যে অভেদ। আবার সাপ ও কুণ্ডলী দৃশ্যতঃ ভিন্ন; এই হিসাবে তাহাদের মধ্যে ভেদ। তদ্রূপ, ব্রহ্মও চিদ্‌বস্তু, জীবও চিদ্‌বস্তু; চিৎ-অংশে তাহাদের মধ্যে কোনওরূপ ভেদ নাই বলিয়া জীব ও ব্রহ্মে অভেদ বলা যায়। "চিত্ত্বাবিশেষাচ্চ ক্বচিদ-ভেদনির্দ্দেশঃ। পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ২৭॥" কিন্তু ব্রহ্ম হইলেন বিভু-চিৎ, আর জীব হইল অণুচিৎ—ব্রহ্মের চিৎ-কণ অংশ; এই হিসাবে তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে। জলদগ্নিরাশি এবং ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ—অগ্নি হিসাবে উভয়ে অভেদ এবং পরিমাণাদিতে উভয়ে ভেদ আছে। জীব এবং ব্রহ্মেও তদ্রূপ ভেদ এবং অভেদ। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও উপসংহারে বলিয়াছেন—"যথাঽহিরিত্যভেদঃ কুণ্ডলাভোগপ্রাংশুত্বাদীনি চ ভেদ এবমিহাপীতি।"

"প্রকাশাশ্রয়দ্বা তেজস্ত্বাৎ॥ ৩।২।২৮॥"—সূর্য্য ও সূর্য্যালোক এই উভয়ের মধ্যে যেমন ভেদ এবং অভেদ (উভয়েই তেজ বলিয়া অভেদ), তদ্রূপ জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যেও ভেদ এবং অভেদ।

"অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে॥ ২।৩।৪৩॥"—জীব ব্রহ্মের অংশ (অংশ ও অংশীতে স্বরূপতঃ অভেদ); আবার নানাব্যপদেশাৎ—জীবও ঈশ্বরের মধ্যে নানা অর্থাৎ ভেদের উল্লেখও আছে। অন্যথা চাপি—ভেদব্যতীত অন্যরূপ অর্থাৎ অভেদের উল্লেখও আছে। যেমন দাশকিতবাদিত্বম—অথর্ব্ববেদে ব্রহ্মসূক্তে "ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মৈব ইমে কিতবাঃ"-বাক্যে সকল মানবকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মে ভেদও আছে, অভেদও আছে। এই সূত্রের ভাষ্যের উপসংহারে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—"চৈতন্যঞ্চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োর্যথাঽগ্নিবিস্ফুলিঙ্গয়োরৌষ্ণ্যম্। অতো ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ।—অগ্নি এবং ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গে যেমন ভেদও আছে, আবার উষ্ণত্বাংশে অভেদও আছে, তদ্রূপ জীব এবং ব্রহ্মেও ভেদও আছে, আবার চৈতন্যাংশে অভেদও আছে। অতএব ভেদাভেদ উভয়ই বিদ্যমান বলিয়া জীব ব্রহ্মের অংশ।

উক্তভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন—অংশ ও অংশীতে ভেদ এবং অভেদ উভয়ই যুগপৎ বর্ত্তমান। জীব যে ব্রহ্মের অংশ, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। জীব ব্রহ্মের অংশ এবং ব্রহ্ম জীবের অংশী হওয়াতে উভয়ের মধ্যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধই সঙ্গত।

ব্রহ্ম ও জীব—স্বরূপে উভয়েই চিদ্‌বস্তু বলিয়া উভয়ের মধ্যে অভেদ। আবার ব্রহ্ম বিভু চিৎ, জীব অণুচিৎ; ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং জীব অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান্; ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা, জীব সৃষ্টিকর্ত্তা নহে; ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জীব তৎকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত; ব্রহ্ম মায়াতীত, মায়ার অধীশ্বর; কিন্তু জীব মায়াকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও কবলিত হওয়ার যোগ্য (অণু বলিয়া), ব্রহ্ম পরমানন্দঘনবিগ্রহ, জীব মায়াবদ্ধ অবস্থায় অশেষ দুঃখের আকর—ইত্যাদি কারণে জীব এবং ব্রহ্মে ভেদ আছে। "অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ॥ ২।১।২২॥—ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন এবং অধিক।" "অধিকোপ-দেশাৎ॥৩.৪।৮॥—ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক।" ইত্যাদি বেদান্তসূত্রে এবং "পৃথক্ আত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা॥ শ্বেতাশ্বতর॥ ১।৬॥—ব্রহ্ম জীবের প্রেরয়িতা বা নিয়ন্তা, জীব ব্রহ্মকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত বলিয়া উভয়কে পৃথক্ জানিবে।" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথা দৃষ্ট হয়।

এইরূপে শ্রুতিবাক্যানুসারে জীবও ব্রহ্মের মধ্যে যুগপৎ নিত্য ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ থাকাতে তাহাদের মধ্যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধই প্রতিষ্ঠিত হইল—মৃগমদ এবং তার গন্ধে, অগ্নি এবং তাহার উষ্ণতায় যেরূপ ভেদাভেদ-সম্বন্ধ, জীব এবং ব্রহ্মে—সাধারণতঃ শক্তি এবং শক্তিমানেও—তদ্রূপ ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। ("অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

ভেদবাচক শ্রুতিবাক্যগুলির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক কেবলমাত্র অভেদবাচক শ্রুতিবাক্যগুলিকেই ভিত্তি করিয়া এবং ভেদাভেদ-তত্ত্বপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যগুলির মুখ্যাবৃত্তির অর্থসঙ্গতি থাকাসত্ত্বেও গৌণী বা লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর জীব-ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে অভেদ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত যে বিচারসহ নয়, ১।৭।১৩-পয়ারের টীকায় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস। শক্তিমানের সেবাই শক্তির কর্ত্তব্য। অংশীর সেবাই অংশের কর্ত্তব্য। বৃক্ষের শিকড়, শাখা, পত্র প্রভৃতি হইল বৃক্ষের অংশ। শিকড় মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ করিয়া বৃক্ষের পুষ্টিসাধন করে। শাখা-পত্রাদিও রৌদ্র-বায়ু হইতে বৃক্ষের জীবন-ধারণোপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিয়া বৃক্ষের পুষ্টিসাধন ও শোভাবৃদ্ধি করে। অংশ শিকড়াদি এইরূপে অংশী বৃক্ষেরই সেবা করে।

জীব ভগবানের শক্তি এবং অংশ। সুতরাং ভগবানের সেবাই হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য। নিজের সম্বন্ধে কোনওরূপ অনুসন্ধান না রাখিয়া—নিজের ইহকালের কি পরকালের সুখসুবিধাদির কথা, এমনকি নিজের দুঃখনিবৃত্তির কথাকেও মনে স্থান না দিয়া—কেবলমাত্র সেব্যের প্রীতি-উৎপাদনই সেবার তাৎপর্য্য। এইরূপে কেবল ভগবৎ-সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবাই হইল জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য। সেবা হইল দাসের ধর্ম্ম। সুতরাং জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাসই হইল। "দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন॥ অপি চ স্মর্য্যতে॥ ২।৩।৪৫-বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্যধৃত স্মৃতিবচন॥—জীব একমাত্র শ্রীহরিরই দাস; কখনও অন্য কাহারও দাস নয়।" শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব॥ ২।২২।১৭॥ জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥ ২।২০।১০১॥"

প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে জীবের আচরণের এবং মনোবৃত্তির কথা বিবেচনা করিলেও বুঝা যায়—সেবার ভাব তাহার যেন মজ্জাগত। সকল সময়ে কেহ অপরের সেবা না করিলেও কখনও যদি কেহ অপরের কোনওরূপ সেবা করিতে পারে, তাহা হইলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে—মনে করে, একটা ভাল কাজ করিলাম। ইহাতেই বুঝা যায়, সেবাকার্য্যটী তাহার হার্দ্দ। রাজপুরুষগণের মধ্যে, এমনকি স্বয়ং রাজপ্রতিনিধিতেও, দেখা যায়, অতি দীনহীন একজন সাধারণ প্রজার নিকটেও পত্রাদি লিখিতে হইলে তাঁহারা নিজেদিগকে "আপনার একান্ত অনুগত সেবক" রূপে অভিহিত করেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহারা যেরূপ ব্যবহারই করুন না কেন, সেবার ভাবটীই যে তাঁহাদের আদর্শ "আপনার একান্ত অনুগত সেবক"-বাক্য হইতে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। রাজা-শব্দের অর্থও প্রজার অনুরঞ্জনকারী—প্রজার প্রীতিবিধানকারী। ইহাতেও প্রজার সেবাই রাজার কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্ধারিত হইতেছে। গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রেও জনসাধারণের সেবাই আদর্শ।

বিচার করিলে দেখা যায়—জ্ঞাতসারে হউক, কি অজ্ঞাতসারেই হউক, জগতের সকল জীবই পরস্পরের সেবা করিতেছে। কৃষক শস্য উৎপাদন করে, ধনী অর্থোপার্জ্জন করে। ধনী অর্থের বিনিময়ে কৃষকের নিকট হইতে শস্য গ্রহণ করে। পরস্পরের প্রয়োজনে এই বিনিময় সাধিত হইলেও তদ্দ্বারা পরস্পরের উপকার বা সেবা হইয়া যাইতেছে। কুকুর, শকুনি প্রভৃতি প্রাণী মানুষের বিরক্তিজনক, অস্বস্তিকর এবং স্বাস্থ্যহানিকারক দ্রব্যাদি অপসারিত করিয়া মানুষের সেবা করিতেছে। চিকিৎসক রোগীর সেবা করিতেছে—ঔষধাদিদ্বারা, আবার রোগীও চিকিৎসকের সেবা করিতেছে—অর্থাদিদ্বারা। প্রশ্ন হইতে পারে, এস্থলে যে সকল সেবার কথা বলা হইতেছে, তাহা তো বাস্তবিক সেবা নয়, যেহেতু এসকল তথাকথিত সেবার কাজ কেহই অপরের সুখসম্পাদনের উদ্দেশ্য নিয়া করে না, করে বরং নিজের প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। উত্তরে বলা যায়—নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই সকলে কাজ করে সত্য; কিন্তু তাহাতে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই যে অপরের উপকার হইতেছে, তাহাতেই বুঝা যায়—নিজ প্রয়োজনসিদ্ধিমূলক প্রয়াসের মধ্যে সেবাবাসনাটী প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিয়াই ঐ প্রয়াসেই অপরের উপকার বা সেবা হইয়া যাইতেছে। জীবস্বরূপ মায়াকবলিত হইয়া মায়িকদেহে এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদিতে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। তাহার স্বরূপানুবন্ধিনী সেবাবাসনা দেহেন্দ্রিয়াদির ভিতর দিয়া বিকশিত হইয়া ইন্দ্রিয়াদির বর্ণে রঞ্জিত হইয়া

দেহেন্দ্রিয়-সেবার বাসনায় রূপান্তরিত হইয়াছে। তাহাতেই জীবের নিজ প্রয়োজনবুদ্ধি এবং তাহাতেই নিজ প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য তাহার প্রয়াস। এই প্রয়াসের প্রবর্ত্তক কিন্তু সেবাবাসনা—যদিও মায়ামুগ্ধ জীব তাহা জানে না। জানুক বা না জানুক, সেই সেবা-বাসনা তাহার ধর্ম্ম—সামান্যমাত্র হইলেও—প্রকাশ করিবেই—হয়তো বিকৃতভাবেই প্রকাশ করিবে। সেই সেবাবাসনাটী যেমন দেহধারী জীবের নিকটে প্রচ্ছন্ন, সেবাবাসনার স্বাভাবিক ধর্ম্মের প্রকাশটীও তাহার নিকটে তেমনি প্রচ্ছন্নই থাকে। তাই দেহধারী জীব মনে করে—তার প্রয়োজন-সিদ্ধি-মাত্রই সে করিল, অপরের সেবা করিল না। কিন্তু সেবা হইয়া যাইতেছে এবং এইরূপ অজ্ঞাতসারেই যে সেবা হইয়া যাইতেছে, তাহাতেই বুঝা যায়—সেবাবাসনাটী জীবের স্বাভাবিক, স্বরূপগত।

দেহধারী জীব আমরা, দাসত্ব তো আমরা করিতেছিই, মুখ্যতঃ মায়ার দাসত্ব; সুতরাং দাসত্ব যে আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু স্বরূপতঃ কাহার দাস আমরা ?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জীব হইল ভগবানের চিদ্রূপা জীবশক্তির অংশ। এই জীবশক্তি অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির যেমন অন্তর্ভুক্ত নয়, তেমনি বহিরঙ্গা মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্তও নয়। সুতরাং জীবস্বরূপের সঙ্গে মায়াশক্তির স্বাভাবিক কোনও যোগ নাই। দেহধারী জীবের সম্বন্ধে মায়া আগন্তুক বস্তু, স্বরূপগত বস্তু নয়; অগ্নিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহের দাহিকাশক্তি যেমন আগন্তুক, তদ্রূপ। সুতরাং মায়ার দাসত্ব জীবের স্বরূপগত দাসত্ব হইতে পারে না। যত দিন জীব মায়ার কবলে থাকিবে, ততদিনই তাহার পক্ষে মায়ার দাসত্ব। যাঁহার সহিত জীবের স্বরূপগত স্বাভাবিক সম্বন্ধ, জীবের স্বরূপগত দাসত্বের সম্পর্কও হইবে তাঁহারই সঙ্গে। জীব ভগবানের অংশ বলিয়া তাহার নিত্য এবং অবিচ্ছেদ্য নিত্যসম্বন্ধও হইতেছে ভগবানের সঙ্গে—আর কাহারও সঙ্গে জীবের এজাতীয় সম্বন্ধ নাই; শিকড়ের বা শাখাপত্রাদির সম্বন্ধ যেমন বৃক্ষের সঙ্গে, তদ্রূপ। সুতরাং জীব স্বরূপতঃ ভগবানেরই দাস, অপর কাহারও নহে। তাই বলা হইয়াছে—"দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন॥"

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতেছে—তত্ত্বের বিচারে না হয় স্বীকার করা যাইতে পারে যে, জীব স্বরূপতঃ ভগবানেরই দাস। কিন্তু এই জগতের দেহধারী জীব আমরা তো ভগবানের দাসত্ব করিতেছি না। এই অবস্থায় কিরূপে জীবমাত্র-সম্বন্ধেই বলা যায়—"কৃষ্ণের নিত্য দাস জীব।"

উত্তরে বলা যায়—দাসত্বের প্রাণবস্তু হইতেছে সেবা। সেবার আবার প্রাণবস্তু হইল সেবাবাসনা। সেবাবাসনাহীন সেবার—ইচ্ছাহীন বাধ্যতামূলক সেবার—কোনও মূল্য নাই। আমাদের সেবাবাসনা স্বরূপগত, নিত্য; সুতরাং আমাদের দাসত্বও নিত্য। স্বরূপতঃ আমরা যখন ভগবানেরই দাস, অন্য কাহারও দাস নই, তখন কেবলমাত্র সেবাবাসনার নিত্যত্বেই আমাদের নিত্য-কৃষ্ণদাসত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে, আমরা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছি না, ইহা সত্য। কিন্তু তাহাতেই আমাদের কৃষ্ণদাসত্ব অন্তর্হিত হয় না। গাছের একটী পত্র যখন গাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখন সেই পত্রদ্বারা আর গাছের সেবা চলিতে পারে না; তথাপি কিন্তু তখনও পত্রটী সেই গাছের পত্রই থাকে।

আমাদের স্বাভাবিকী সেবাবাসনা নিত্যই বিকশিত হইতেছে। তাহার লক্ষ্য কিন্তু ভগবান্‌ই, অপর কেহ নহে; যেহেতু অপর কাহারও সহিত তাহার স্বাভাবিক নিত্য-সম্বন্ধ নাই। কিন্তু নিত্য বিকশিত হইলেও বিকাশের পথে মায়ার আবরণে প্রতিহত হইতেছে বলিয়া লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারে না। কোনও পতিব্রতা রমণী দূরদেশস্থিত পতির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া যদি পথ ভুলিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়, তাহা হইলেও পতির সহিত তাহার সম্বন্ধ নষ্ট হইবে না।

বস্তুতঃ অজ্ঞাতসারেও আমরা ভগবানেরই অনুসন্ধান করিতেছি। জীবের চিরন্তনী সুখবাসনাই তাহার প্রমাণ। আমরা যাহা কিছু করি, সংসমস্তই সুখের জন্য। কিন্তু সংসারে আমরা যাহা কিছু সুখ পাই, তাহাতে এই চিরন্তনী সুখবাসনার চরমা তৃপ্তি হয় না। তাহাতেই বুঝা যায়, আমরা যে সুখটী চাই, তাহার স্বরূপ আমরা জানি না; সুতরাং তাহার প্রাপ্তির উপায়ও অবলম্বন করি না; তাই তাহা পাইওনা। বস্তুতঃ সুখ-

স্বরূপ, রসস্বরূপ পরতত্ত্ব-বস্তুর জন্যই আমাদের চিরন্তনী বাসনা; তাঁহাকে পাইলেই আমাদের চিরন্তনী সুখবাসনার চরমা তৃপ্তিলাভ হইতে পারে। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি ॥—শ্রুতিঃ॥" (বিস্তৃত আলোচনা ১।১।৪ শ্লোকের টীকায় আদিলীলার ৮—১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। রসস্বরূপ পরতত্ত্ব-বস্তুর জন্য—শ্রীকৃষ্ণের জন্য—আমাদের এই চিরন্তনী বাসনাই আমাদের নিত্য কৃষ্ণদাসত্ব-ভাবের পরিচায়ক—যদিও তাহার অনুভূতি আমাদের নাই।

যাহা হউক, জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্য দাস, তাহা প্রমাণিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ সেব্য, জীব তাঁহার সেবক।

এই জগতে দাসত্ব-সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা, কৃষ্ণদাসত্ব কিন্তু সেরূপ নয়। পূর্বে পৃথিবীর কোনও কোনও স্থলে ক্রীতদাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। ক্রীতদাসদের দুর্দশার অবধি ছিলনা। অনেক গৃহস্থও বাড়ীতে পাচক রাখেন, ভৃত্য রাখেন। তাহাদের অবস্থা ক্রীতদাসের মত শোচনীয় না হইলেও খুব লোভনীয় নয়। তাহার কারণ, ক্রীতদাস বা পাচক-ভৃত্য এবং তাহাদের মনিব—ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধটী হইতেছে কেবলই স্বার্থের সম্বন্ধ। সকলেই নিজ নিজ সুখ-সুবিধাটী চায়; ভৃত্যাদির মনেও মনিবের সুখ প্রাধান্য লাভ করেনা, মনিবের মনেও ভৃত্যাদির সুখ প্রাধান্য লাভ করে না। তাই তাদের সম্বন্ধটী সুখময় হইতে পারে না। প্রীতির বন্ধন নাই।

সংসারে কিছু প্রীতির বন্ধন আছে—স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে, মাতা ও সন্তানের মধ্যে। মাতা শিশুসন্তানের সেবা করেন—কাহারও আদেশে বা অনুরোধে নয়; নিজের প্রাণের টানে। স্ত্রী স্বামীর সেবা করেন, বা স্বামী স্ত্রীর সেবা করেন—সুখ-সুবিধাদির বিধান করেন, প্রীতির টানে। তাই এই সকল সেবায় কিছু সুখ আছে। কিন্তু ইহাতেও নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই। কারণ, এস্থলেও প্রীতির সঙ্গে স্বার্থ জড়িত। স্বামিস্ত্রীর পরস্পরের সেবার মধ্যে স্বসুখ-বাসনা আছে। মাতার সন্তান-সেবায় কিছুটা স্বসুখ-বাসনা আছে। তাহাদের সম্বন্ধটাও স্বরূপগত নয়, আগন্তুকমাত্র। যে দু'জন এখন পতি-পত্নী সম্বন্ধে আবদ্ধ, সামাজিক বা শাস্ত্রীয়-বিধি দ্বারাই কোনও এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহারা পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়াছে। বিবাহের পূর্বে এই সম্বন্ধ ছিল না, মৃত্যুর পরেও থাকিবে না। মাতা ও সন্তান—জন্মের পূর্বে, পূর্বজন্মে হয়তো এই সম্বন্ধ ছিল না, পরজন্মেও হয়তো থাকিবে না। আবার লৌকিক জগতের এসব সম্বন্ধও মাত্র দেহের সঙ্গে। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সম্বন্ধ মুখ্যতঃ দেহের সম্বন্ধ। মাতার সঙ্গে সন্তানের সম্বন্ধও দেহের সম্বন্ধ—মাতার দেহ হইতে সন্তানের দেহের জন্ম। পরস্পরের সেবার সুখও দেহের এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদির সুখ। তাই যখনই সেবার ব্যাপারে দেহের দুঃখের সম্ভাবনা থাকে, তখনই সেই সেবা আর সুখকর হয় না। দেহ অনিত্য, এই সুখও অনিত্য।

কিন্তু ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ হইতেছে নিত্য এবং অবিচ্ছেদ্য। আমাদের মধ্যে সেই সম্বন্ধের জ্ঞান না থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাতে সম্বন্ধ নষ্ট হইতে পারে না। সন্তানের যখন জন্ম হয়, তখন পিতা যদি বিদেশে থাকেন এবং তাহার বহু বৎসর পরে যদি পিতা আসিয়া সন্তানের সাক্ষাতে উপস্থিত হন, পুত্র তাঁহাকে পিতা বলিয়া চিনিতে পারিবে না। কিন্তু তাহাতেও পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ অক্ষুণ্নই থাকিবে।

সংসারী জীব আমরা অনাদিকাল হইতে ভগবান্‌কে ভুলিয়া আছি; তাঁহার সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহাও আমরা জানি না। কোনও ভাগ্যে যদি আমাদের এই অনাদি ভগবদ্-বিস্মৃতি দূর হইয়া যায়, তাহা হইলে ভগবানের সহিত আমাদের সম্বন্ধের জ্ঞান আপনা-আপনিই স্ফুরিত হইবে—মেঘ-নির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায়। মেঘ-নির্ম্মুক্ত সূর্য্য প্রকাশিত হইলে তাহার কিরণজালও যেমন স্বতঃই বিকশিত হয়, ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধের জ্ঞান স্ফূর্ত্তিলাভ করিলেও সেই সম্বন্ধের স্বরূপগত কৃষ্ণদাসত্বের জ্ঞানও তেমনি স্বতঃই স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে। তখনই জীব ভগবৎ-সেবার জন্য লুব্ধ হইবে, উৎকণ্ঠিত হইবে—কেন হইবে, এই প্রশ্ন উঠে না। ইহা সম্বন্ধেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সূর্য্য উদিত হইলে তাহার কিরণজালও যেমন স্বভাবতঃই বিকশিত হয়, তদ্রূপ। তখন ভগবানের স্বরূপশক্তির কৃপালাভ করিয়া (নিত্যমুক্ত ও বদ্ধজীব প্রবন্ধাংশ দ্রষ্টব্য) ভগবানের সেবা পাইয়া ধন্য হইবে, নিজেকে পরম-কৃতার্থ জ্ঞান করিবে।

এই সেবাতে প্রাকৃত জগতের সেবার ন্যায় ক্লান্তি নাই, গ্লানি নাই, দুঃখের মিশ্রণ নাই। আছে নিরাবিল নিরবচ্ছিন্ন এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধমান আনন্দ। ইহা প্রীতির সেবা। জীব এই সেবা করে একমাত্র ভগবানের সুখের

উদ্দেশ্যে। এই সেবা কেবল এক তরফা নহে। ভক্ত জীব (যিনি ভগবৎ-সেবা করেন, তাঁহাকেই ভক্ত বলে। ভক্তজীব) যেমন সর্ব্বদা চাহেন ভগবানের সুখ, ভগবানও সর্ব্বদা চাহেন ভক্তের সুখ। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—"মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥" ভক্ত ভগবান্‌কে তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় মনে করেন, ভগবান্‌ও ভক্তকে তদ্রূপ প্রিয় মনে করেন। ভক্ত যেমন ভগবান্‌কে ছাড়া আর কিছু জানেন না, ভগবানও তেমনি ভক্ত ছাড়া আর কিছুই জানেন না। তাই ভগবান্ নিজ মুখেই বলিয়াছেন—"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ শ্রী, ভা, ৯।৪।৬৮॥" তখন ভগবানের সঙ্গে ভক্তের হয় নিতান্ত আপনা-আপনি ভাব—মদীয়তাময় ভাব। এই ভাবের ভগবৎ-সেবাতে অপরিসীম আনন্দ।

নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞানমার্গের সাধক তাঁহার সাধনের সিদ্ধিতে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্যমুক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দসমুদ্রে নিমগ্ন হন। অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র সুখরাশিকে একত্র করিলেও এই ব্রহ্মানন্দের এক কণিকার তুল্যও হইবে না। প্রাকৃত জগতের আনন্দ হইল প্রাকৃত সত্ত্বগুণজাত, জড়, অনিত্য, দুঃখসঙ্কুল এবং ক্ষুদ্র। আর ব্রহ্মানন্দ হইল অপ্রাকৃত—মায়াতীত, চিন্ময়, নিত্য, দুঃখ-গন্ধ-লেশশূন্য এবং পরিমাণে বিভু। কিন্তু এতাদৃশ ব্রহ্মানন্দও শ্রীকৃষ্ণসেবাসুখের তুলনায়—সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদতুল্য। "ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে। সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো॥ হরিভক্তিসুধোদয়॥" তাহার হেতু এই। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে চিচ্ছক্তির বিলাস নাই বলিয়া ব্রহ্মানন্দ হইল কেবল আনন্দসত্তামাত্র—বৈচিত্রীহীন আনন্দসত্তা। ব্রহ্মে আনন্দের বৈচিত্রী নাই, আস্বাদনচমৎকারিত্বের বৈচিত্রী নাই, রসত্বেরও বিকাশ নাই। কিন্তু পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে সমগ্রশক্তির পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া তাঁহাতে আনন্দবৈচিত্রীর এবং আস্বাদন-চমৎকারিত্বেরও পূর্ণতম অভিব্যক্তি এবং রসত্বেরও পূর্ণতম অভিব্যক্তি। সেবার উপলক্ষ্যে ভক্তজীব অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিতাময় এসকল আনন্দবৈচিত্রীর ও রসবৈচিত্রীর আস্বাদন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন। আরও একটী হেতু আছে। অখিল-রসামৃতবারিধি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক ভক্তবাৎসল্যবশতঃ অনন্ত রসবৈচিত্রীর আস্বাদন করাইয়া তাঁহার ভক্তবৃন্দকে সুখী করার জন্য সর্ব্বদা উৎকন্ঠিত; এই উৎকণ্ঠাবশতঃই তাঁহার বিবিধ লীলা। "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়া॥" লীলাতে রসের উৎস প্রবাহিত হয়, ভক্ত তাহা আস্বাদন করেন। এই বস্তুটী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে নাই; যেহেতু, চিচ্ছক্তির বিকাশের অভাবে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে ভক্তবাৎসল্যের বিকাশও নাই, রসের বিকাশও নাই, রসোৎসারিণী লীলাও নাই। ব্রহ্মের দিক্ হইতে মুক্তজীবকে আনন্দ আস্বাদন করাইবার কোনও চেষ্টা নাই। ব্রহ্মানন্দের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই মুক্তজীব তাহার আস্বাদন পাইয়া থাকেন—তাহাও কেবল আনন্দসত্তামাত্রের। এসমস্ত কারণেই ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা কৃষ্ণসেবানন্দের সর্ব্বাতিশায়িত্ব এবং পরম-লোভনীয়ত্ব।

সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত জীবের কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধের জ্ঞান সম্যক্‌রূপে স্ফুরিত হইতে পারেনা। তাঁহার মধ্যে এই সম্বন্ধ বিকাশের প্রতিকূল একটা ভাব আছে, যাহা সম্বন্ধবিকাশের বাধা জন্মায়। সাধনের আরম্ভ হইতেই এই ভাবটী তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান এবং সাধারণতঃ মুক্তাবস্থায়ও থাকে। এই ভাবটী জীবের স্বরূপানুবন্ধী নহে, ইহা আগন্তুক। জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞানই এই ভাব। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই ঐক্যজ্ঞান বর্ত্তমান থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীবের স্বরূপানুবন্ধী সেব্য-সেবক ভাব হৃদয়ে স্থান পাইতে পারিবেনা। তাই সম্বন্ধের জ্ঞানটী সম্যক্ বিকাশের পথে বাধা প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু সাধনকালে যদি কোনও সময়ে কাহারও ভক্তিবাসনা বা ভগবৎ-সেবার বাসনা কোনও ভাগ্যে জাগিয়া থাকে, তাহা হইলে, পূর্ব্বে না হইলেও অন্ততঃ মুক্তাবস্থাতেও সেই বাসনা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া মুক্তজীবের সম্বন্ধজ্ঞান-বিকাশের প্রতিকূল ভাবকে অপসারিত করিয়া সম্বন্ধের জ্ঞানকে সম্যক্‌রূপে বিকশিত করে এবং সেই মুক্তজীবের চিত্তেও শ্রীকৃষ্ণ-সেবাবাসনা জাগাইয়া তাঁহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণভজন করাইয়া থাকে। একথা শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও বলিয়া গিয়াছেন। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে। নৃসিংহতাপনীর শঙ্করভাষ্য।" শ্রুতিও এইরূপ মুক্তজীবদের ভগবদ্ভজনের কথা বলিয়া থাকেন। "মুক্তা অপি হি এনম্ উপাসত ইতি সৌপর্ণশ্রুতিঃ॥"

বেদান্তও একথা বলিয়াছেন। "আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্॥ ব্র, সূ, ৪।১।১২॥" (১।৭।৮১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।)

প্রশ্ন হইতে পারে, মুক্তাবস্থায় যাঁহারা ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন আছেন, তাঁহারা আবার কিসের জন্য ভগবানের উপাসনা করিবেন? উত্তরে বলা যায়—কোনও উদ্দেশ্যদ্বারা পরিচলিত হইয়া তাঁহারা ভগবদ্-ভজন করেন না; মুক্তজীবেরা ভগবদ্ভজন করেন—ভগবৎ-সেবার সর্ব্বাতিশায়ী আনন্দের লোভে লুব্ধ হইয়া। পিত্তদগ্ধ ব্যক্তি মিশ্রী পান করেন একটা প্রয়োজনবোধে—পিত্ত দূর করার প্রয়োজনে। কিন্তু পিত্তের প্রকোপ যখন দূরীভূত হইয়া যায়, তখন তিনি মিশ্রী খাওয়া ছাড়িতে পারেন না—মিশ্রীর মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া। "মুক্তৈরুপাসনং ন কার্য্যং বিধিফলয়োরভাবাৎ। সত্যং তদা বিধ্যভাবেঽপি সৌন্দর্য্যবলাদেব তৎপ্রবর্ত্ততে। পিত্তদগ্ধস্য সিতয়া পিত্তনাশেঽপি সতি ভূয়স্তদাস্বাদবৎ॥ ৪।১।১২-বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্য।" উল্লিখিত শ্রুতি-বেদান্তবাক্য ব্রহ্মানন্দ হইতেও কৃষ্ণসেবানন্দের পরমলোভনীয়ত্ব সূচিত করিতেছে।

শ্রুতি পরতত্ত্ববস্তুকে আনন্দস্বরূপ—রসস্বরূপ—সুতরাং পরম মধুর, পরম আস্বাদ্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এই রসস্বরূপের প্রাপ্তিতেই যে জীবের চিরন্তনী সুখবাসনার চরমা তৃপ্তি সাধিত হইতে পারে, অন্য কিছুতে নহে, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন। "রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি॥" তাঁহার প্রাপ্তিতে অর্থাৎ তাঁহার মাধুর্য্যের আস্বাদনেই জীব কৃতার্থ হইতে পারে—ইহাই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য। কিন্তু "কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্যাস্বাদন। ভক্তভাবে করে তার মাধুর্য্যচর্ব্বণ॥১।৬।৮৯॥"—রসস্বরূপকে আস্বাদন করার একমাত্র উপায়—ভক্তভাব, সেবকের ভাব। তাঁহার মাধুর্য্যও আবার এমনই লোভনীয়, এমনই চিত্তাকর্ষক যে, অন্যান্যের কথা তো দূরে, এই মাধুর্য্য "কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা সভার মন। পতিব্রতাশিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥" আবার শ্রীকৃষ্ণ নিজের মাধুর্য্য দেখিয়া নিজেই প্রলুব্ধ হন এবং "আপনি আপনা চাহে করিতে আস্বাদন।"

এমন যে পরমলোভনীয় শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য, তাহার আস্বাদন সম্ভব—কেবলমাত্র দাস্যভাবে, ভক্তভাবে। তাই, এই দাস্যভাবের জন্য সকলেই লালায়িত। (আদিলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ৪৯-৯৭ পয়ার ও টীকা দ্রষ্টব্য) এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। "অন্যের আছুক কার্য্য আপনে শ্রীকৃষ্ণ। আপন মাধুর্য্যপানে হইয়া সতৃষ্ণ॥ স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন। ভক্তভাব বিনা নহে তাহা আস্বাদন॥ ভক্তভাব অঙ্গী করি হৈলা অবতীর্ণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ॥ ১।৬।৯৩-৯৫॥" এ জন্যই বলা হইয়াছে—"কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ। আত্মা হইতে কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাস্পদ॥ ১।৬।৮৭॥"

এতাদৃশ ভক্তভাব বা দাস্যভাবই জীবের স্বরূপানুবন্ধীভাব। এই ভাবের আনুগত্যেই জীব এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় শ্রুতিপ্রতিপাদিত পরম-লোভনীয় বস্তুর আস্বাদন পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারে। প্রাকৃত জগতের দাস্য—জীবের স্বরূপানুবন্ধী দাস্যভাবের অতি বিকৃত ছায়ার সঙ্গেও তুলিত হইতে পারে না।

জীবের স্বরূপানুবন্ধি দাসত্ব—প্রাকৃত জগতের নীরস দাসত্ব নহে; ইহা হইতেছে—নিতান্ত আপনজনবোধে, পরম-প্রিয়তমজ্ঞানে অখিল-রসামৃতবারিধি স্বীয়-ভক্তজনের প্রীতিবিধানলোলুপ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রীতিপূর্ণ মনপ্রাণঢালা-প্রীতিবিধান-প্রয়াস।

নিত্যমুক্ত ও বদ্ধ জীব। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—জীব সংখ্যায় অনন্ত। এই জীব দুই শ্রেণীর। একশ্রেণী অনাদিকাল হইতেই ভগবদুন্মুখ; আর একশ্রেণী অনাদিকাল হইতেই ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ। "তদেবমনন্তা এব জীবাখ্যা তটস্থাঃ শক্তয়ঃ। তত্র তাসাং বর্গদ্বয়ম্। একোবর্গঃ অনাদিত এব ভগবদুন্মুখঃ অন্যস্তু অনাদিত এব ভগবৎ-পরাঙ্মুখঃ স্বভাবতঃ তদীয় জ্ঞানভাবাৎ তদীয় জ্ঞানাভাবাৎ চ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৪৪॥" অনাদিকাল হইতেই যাঁহাদের ভগবদ্‌জ্ঞান (ভগবৎস্মৃতি) আছে, তাঁহারা অনাদিকাল হইতেই ভগবদুন্মুখ আর অনাদিকাল হইতেই ভগবদ্‌জ্ঞান (ভগবৎ-স্মৃতি) যাঁহাদের নাই, তাঁহারা অনাদিকাল হইতেই ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ।

যাঁহারা অনাদিকাল হইতেই ভগবদুন্মুখ, অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির বিলাস-বিশেষের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া তাঁহারা অনাদিকাল হইতেই নিত্য ভগবৎ-পরিকর-স্বরূপ। "তত্র প্রথমঃ অন্তরঙ্গা-শক্তিবিলাসানুগৃহীতঃ নিত্য ভগবৎ-পরিকররূপঃ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ॥ ৪৫॥"

আর যাঁহারা অনাদিকাল হইতেই ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ, ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতাবশতঃ ম্যায়াকর্ত্তৃক পরিভূত হইয়া তাঁহারা সংসারী (স্থষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে মায়াবদ্ধ জীব) হইয়াছেন। "অপরস্তু তৎপরাঙ্মুখত্বদোষেণ লব্ধচ্ছিদ্রয়া মায়য়া পরিভূতঃ সংসারী॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ॥ ৪৫॥"

একথাই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীকে বলিয়াছেন। "সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার। এক নিত্যমুক্ত, একের নিত্যসংসার॥ নিত্যমুক্ত—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ। কৃষ্ণপারিষদ নাম—ভুঞ্জে সেবাসুখ॥ নিত্যবন্ধ—কৃষ্ণ হৈতে নিত্যবহির্ম্মুখ। নিত্যসংসারী ভুঞ্জে নরকাদিদুঃখ॥ সেই দোষে মায়াপিশাচী দণ্ড করে তারে। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে তারে জারি মারে॥ ২।২২।৮-১১॥" এই কয় পয়ারে উপরে উদ্ধৃত পরমাত্ম-সন্দর্ভের উক্তির মর্ম্মই প্রকাশ করা হইয়াছে; সুতরাং পরমাত্মসন্দর্ভের উক্তির আনুগত্যেই এই কয় পয়ারের মর্ম্ম অবগত হইতে হইবে। সুতরাং পয়ারোক্ত "নিত্যসংসার", "নিত্যবন্ধ" "নিত্যবহির্ম্মুখ" এবং "নিত্যসংসারী" বাক্যসমূহের অন্তর্গত "নিত্য"-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে "অনাদি।" অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডবাসী সংসারী জীব অনাদিকাল হইতেই "বদ্ধ বহির্ম্মুখ এবং সংসারী।" এই শ্রেণীর জীবসম্বন্ধে পরমাত্মসন্দর্ভ "অনাদি"-শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। কবিরাজগোস্বামী ঐ "অনাদি"-অর্থেই "নিত্য"-শব্দ ব্যবহাব করিয়াছেন। "নিত্য"-শব্দের একটী ব্যঞ্জনা এই যে, যেসমস্ত জীব এই সংসারে আছেন, তাঁহারা অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া এপর্য্যন্ত "নিত্য অর্থাৎ নিরবিচ্ছিন্ন ভাবেই" বহির্ম্মুখ, সংসারী এবং মায়াবদ্ধ। মধ্যভাগে তাঁহাদের কেহই কখনও শ্রীকৃষ্ণসমীপে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। সাধন-প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় ভগবদ্ধামে একবার যাঁহারা যাইতে পারেন, তাঁহাদের আর সেস্থান হইতে ফিরিয়া আসিতে হয় না। একথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন। "যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ গীতা। ১৫।৬॥" নিত্য-শব্দের সাধারণ অর্থ হইতেছে—অনাদি এবং অনন্ত; উল্লিখিত পয়ারসমূহে "নিত্য"-শব্দের এই সাধারণ অর্থ ধরিলে বুঝা যায়, সংসারী জীবের সংসার বা মায়াবন্ধন নিত্য—অর্থাৎ ইহার অন্ত বা শেষ নাই। ইহা যে কবিরাজগোস্বামীর অভিপ্রেত নয়, পরবর্ত্তী পয়ার হইতেই তাহা বুঝা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিরূপে কবিরাজগোস্বামী ব্যক্ত করিয়াছেন—এই "নিত্যবন্ধ", "নিত্য সংসারী" এবং "নিত্যবহির্ম্মুখ" জীব, "ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়॥ তার উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পালায়। কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণনিকট যায়॥ ২।২২।১২-১৩॥"—ময়াবদ্ধ জীবও মহৎ-কৃপার ফলে মায়ামুক্ত হইয়া "কৃষ্ণনিকট যায়"—পার্ষদরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাইতে পারে।

মায়াবদ্ধ জীবের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা অনাদি, কিন্তু বিনাশী—দূরীভূত হওয়ার যোগ্য। নচেৎ সাধনোপদেশেরই সার্থকতা থাকেনা।

অনাদিকাল হইতে ভগবদুন্মুখ জীব সম্বন্ধে পরমাত্মসন্দর্ভ বলিয়াছেন—"অন্তরঙ্গা-শক্তিবিলাসানুগৃহীতঃ নিত্য-ভগবৎ-পরিকররূপঃ।—অন্তরঙ্গা শক্তির বিলাসবিশেষদ্বারা অনুগৃহীত হইয়া নিত্য ভগবৎ-পার্ষদরূপ।" যাঁহারা অনাদিকাল হইতেই ভগবদুন্মুখ, তাঁহাদিগকে কখনও মায়ার কবলে পতিত হইতে হয় নাই। অনাদিকাল হইতেই তাঁহারা অন্তরঙ্গাশক্তির বা স্বরূপশক্তির বিলাসবিশেষদ্বারা অনুগৃহীত এবং এইভাবে অনুগৃহীত বলিয়াই অনাদিকাল হইতে তাঁহারা নিত্য-ভগবৎ-পরিকররূপে ভগবানের সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। স্বরূপ-শক্তিকর্ত্তৃক অনুগৃহীত না হইলে, স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস হওয়া সত্ত্বেও পরিকররূপে ভগবৎ-সেবার সৌভাগ্য তাঁহাদের হইত না—ইহাই পরমাত্মসন্দর্ভের উক্তি হইতে সূচিত হইতেছে। তাহার হেতু এই যে—জীবের স্বরূপে অন্তরঙ্গা শক্তি বা স্বরূপ-শক্তি নাই (১।৪।৯-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য) এবং স্বরূপশক্তিই ভগবানের সেবার পক্ষে অপরিহার্য্যা যহেতু ভগবান্ হইতেছেন আত্মারাম, স্বরাট্, স্বশক্ত্যেক-সহায়। ভক্তি বা প্রেম ব্যতীত

ভগবানের সেবা হইতে পারে না। ভক্তি বা প্রেম হইল স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ; তাই স্বরূপ-শক্তির এই বৃত্তি-বিশেষের কৃপা না পাইলে কেহই ভগবৎ-সেবা বা ভগবৎ-পার্ষদত্ব পাইতে পারেন না।

কিন্তু স্বরূপশক্তিহীন জীব কিরূপে এই স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষের কৃপা পাইতে পারেন? শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হ্লাদিনী-প্রধান স্বরূপ-শক্তির সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি-বিশেষকে সর্ব্বদাই ভক্তবৃন্দের চিত্তে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন; তাহা ভক্তচিত্তে আসিয়া ভগবৎ-প্রীতিনামে খ্যাত হয় এবং ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েরই পরমাস্বাদ্য হইয়া থাকে। "তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষ্বেব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎ-প্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যতিশয়ং ভজত ইতি। অতএব তৎসুখেন ভক্তভগবতো পরস্পরম্ আবেশমাহ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ। ৬৫॥" শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ অনাদিকাল হইতে ভগবদুন্মুখ জীবের চিত্তে আসিয়া ভগবৎ-প্রেম রূপে পরিণত হইয়া ভগবৎ-সেবায় পরমোৎকণ্ঠা জন্মাইয়া তাহাকে ভগবৎ-সেবার উপযুক্ত করে এবং পার্ষদত্ব দান করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করে। এইরূপেই নিত্যমুক্ত জীব স্বরূপশক্তিকর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া থাকেন।

সংসার-বন্ধনের হেতু। নিত্যমুক্ত জীব স্বরূপশক্তির কৃপায় অনাদিকাল হইতেই পার্ষদরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের কখনও মায়িক সংসারজালে আবদ্ধ হইতে হয় না। আর আমরা অনাদিকাল হইতেই মায়িক সংসারজালে আবদ্ধ; পার্ষদরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য আমাদের কখনও হয় নাই। স্বরূপশক্তির কৃপালাভ করার সৌভাগ্যও কখনও আমাদের হয় নাই। অনাদিকাল হইতেই আমরা মায়ার গুণজালে জড়িত হইয়া কখনও স্থাবর-দেহে, কখনও বা জঙ্গম-দেহে বিচরণ করিতেছি।

প্রশ্ন হইতে পারে, এই সংসারেও আমরা কিছু না কিছু সুখ তো উপভোগ করিতেছি। হ্লাদিনীই তো সুখ দিতে পারেন; অপর কেহ পারে না। হ্লাদিনী হইল ভগবানের স্বরূপ-শক্তি। এই সংসারেও আমরা সুখ যখন পাইতেছি, তখন আমাদের প্রতি হ্লাদিনীর বা স্বরূপশক্তির যে কৃপা নাই, তাহা কিরূপে বলা হয়?

উত্তর—এই সংসারে আমরা কিছু কিছু সুখ ভোগ করিয়া থাকি, সত্য। কিন্তু ইহা হ্লাদিনী-প্রদত্ত সুখ নহে। হ্লাদিনী হইল চিচ্ছক্তি, চেতনাময়ী-শক্তি। হ্লাদিনী হইতে জাত সুখও হইবে চিন্ময়সুখ, নিত্যসুখ। আমাদের জড়দেহের সঙ্গে তাহার যোগ হইতে পারে না; চিৎ-এর সঙ্গে কখনও জড়ের স্পর্শ হইতে পারে না। জড়ের সঙ্গেই জড়ের সম্বন্ধ; চিৎ-এর সঙ্গেই চিৎ-এর সম্বন্ধ। জড় খাদ্যদ্রব্য জড় দেহেরই পুষ্টিসাধন করে, আত্মার ধর্ম্মকে পুষ্ট করিতে পারে না। আমাদের প্রাকৃত-জগতের সুখ হইল জড়-দেহের সুখ; সুতরাং তাহাও হইবে জড়বস্তু হইতে জাত—অনিত্য এবং জড় বা চিদ্‌বিরোধী। ইহা হ্লাদিনী হইতে জাত নহে; ইহা প্রাকৃত সত্ত্বগুণ হইতে জাত। সত্ত্বগুণ অনিত্য জড়সুখ জন্মাইতে পারে বলিয়াই ইহার অপর একটী নাম হ্লাদকরী শক্তি। "হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥ বি, পু, ১।১২।৬৯॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"হ্লাদকরী মনঃপ্রসাদোত্থা সাত্ত্বিকী।" মায়ার এই সাত্ত্বিকী-শক্তি কেবলমাত্র মায়াবদ্ধজীবেই থাকে; সুতরাং ইহাই জীবের পক্ষে হ্লাদকরী বা জীবের সুখোৎপাদিকা।

গীতা হইতেও এই কথাই জানা যায়। "তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্। সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥ ১৪।৬॥—হে অনঘ (অর্জ্জুন), মায়ার এই গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ স্বচ্ছতা, প্রকাশত্ব এবং নিরুপদ্রবতাবশতঃ সুখ ও জ্ঞানের সঙ্গ দ্বারা জীবকে বন্ধন করিয়া থাকে।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অনাময়ং চ নিরুপদ্রবম্। শান্তমিত্যর্থঃ। অতঃ শান্তত্বাৎ স্বকার্য্যেন সুখেন যঃ সঙ্গস্তেন বধ্নাতি। প্রকাশকত্বাচ্চ স্বকার্য্যেন জ্ঞানেন যঃ সঙ্গস্তেন চ বধ্নাতি।" এই টীকা হইতে জানা গেল, সত্ত্বগুণের কার্য্যই সুখ এবং জ্ঞান। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও এই শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"সুখসঙ্গেন। সুখ্যহমিতি বিষয়ভূতস্য সুখস্য বিষয়িণি আত্মনি সংশ্লেষাপাদনেনৈব। মৈব সুখং জাতমিতি মৃষৈব সুখেন সঞ্জনমিতি। সৈষাঽবিদ্যা।... অতোঽবিদ্যয়ৈব স্বকীয়ধর্ম্মভূতয়া বিষয়বিষয্যবিবেকলক্ষণয়াঽস্বাত্মভূতে সুখে সঞ্জয়তীব সক্তমিব করোতি।" এই

ভাষ্য হইতেও জানা গেল—বিষয় হইতেই সুখজন্মে (বিষয়ভূতস্য সুখস্য) এবং সুখ হইল অবিদ্যার আত্মভূত—অবিদ্যা হইতে জাত।

সুতরাং প্রাকৃত জগতের সুখ হ্লাদিনী হইতে জাত নহে।

কিন্তু আমরা কেন সংসারী হইলাম? আর নিত্যমুক্ত জীবেরা কেন নিত্যমুক্ত হইলেন?

পূর্ব্বোদ্ধৃত পরমাত্মসন্দর্ভবাক্যেই তাহার উত্তর পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা অনাদিকাল হইতেই ভগবদুন্মুখ, অনাদিকাল হইতেই ভগবৎ-স্মৃতি যাঁহাদের চিত্তে জাগ্রত, তাঁহারা নিত্যমুক্ত; মায়া তাঁহাদিগকে কবলিত করিতে পারে নাই। আর যাঁহারা অনাদিকাল হইতেই ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ, অনাদিকাল হইতেই যাঁহারা ভগবান্‌কে ভুলিয়া আছেন, তাঁহারাই মায়ার কবলে পড়িয়া সংসারী হইয়াছেন। তাঁহারাই আমরা। "কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুখ ॥২।২০।১০৪॥" শ্রীমদ্‌ভাগবতও বলেন—"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ ঈশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ॥ ১১।২।৩৭—পরমেশ্বর হইতে বিমুখ জীবের স্বরূপের বিস্মৃতি জন্মে এবং তজ্জন্য দেহে আত্মাভিমান জন্মে। দ্বিতীয় বস্তু যে দেহেন্দ্রিয়াদি, তাহাতে অভিনিবেশ জন্মিলেই ভয় জন্মে।" অনাদিকাল হইতেই ভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকার তাৎপর্য্য হইতেছে—অনাদিকাল হইতেই ভগবৎ-স্মৃতিহীন।

কিন্তু কেন আমরা অনাদিকাল হইতেই ভগবৎ-স্মৃতিহীন, ভগবদ্-বহির্ম্মুখ হইয়া আছি? এই কেন'র কোন অর্থ নাই। অনাদিসিদ্ধ বস্তুসম্বন্ধে কেন বলা চলে না।

মায়ার কবলে কেন এবং কিরূপে পড়িলাম? জীবের একটা চিরন্তনী সুখবাসনা আছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই সুখবাসনা যে জীবস্বরূপেরই বাসনা, তাহাও বলা হইয়াছে। জীবস্বরূপের বাসনা বলিয়া ইহা নিত্য, অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান। অনাদিকাল হইতেই আমরা সুখের অনুসন্ধান করিতেছি। কিন্তু সুখের মূল উৎস সুখস্বরূপ—আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া আছি বলিয়া, সুখের অনুসন্ধানের ব্যাপারে তাঁহার কথা মনে জাগিতে পারে না। তাঁহার দিকে পেছন ফিরিয়া আছি বলিয়া, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিও পড়িতে পারে না, তাঁহাকে দেখিলেও অন্ততঃ বুঝিতে পারিতাম যে, আমাদের চিরন্তনী সুখবাসনার চরমা তৃপ্তি তাঁহার নিকটেই পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহাকে দেখিও না। যেদিকে আমরা মুখ ফিরাইয়া ছিলাম, সেদিকে আছেন মায়া—তাঁহার প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সুখভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া (সৃষ্টিপ্রবাহও অনাদি)। আমরা মনে করিলাম, এই ব্রহ্মাণ্ডেই আমাদের সুখবাসনার চরমাতৃপ্তি লাভ হইতে পারিবে। তাই এই সংসারের দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম, পড়িয়া সংসারের অধিষ্ঠাত্রী মায়াদেবীর চরণে আত্মসমর্পণ করিলাম। আমরাই মায়ার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, মায়ার চরণকে আলিঙ্গন করিয়াছি, মায়া আমাদিগকে জোর করিয়া টানিয়া আনেন নাই। শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে তাহাই জানা যায়। "স যদজয়াত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্ ভজতি সরূপতাং তদনুমৃত্যুমপেতভগঃ। ১০।৮৭।৩৮॥—সেই জীব যখন মুগ্ধ হইয়া মায়াকে আলিঙ্গন করেন, তখন দেহেন্দ্রিয়াদির সেবা করতঃ তদ্ধর্ম্মযুক্ত হইয়া স্বরূপবিস্মৃত হইয়া জন্ম-মরণরূপ সংসার প্রাপ্ত হন। অজামবিদ্যাম্ অনুশয়ীত আলিঙ্গেত—স্বামী।" মায়াও আমাদিগকে অঙ্গীকার করিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "পরঃ স্বশ্চেত্যসদ্‌গ্রাহঃ পুংসাং যন্মায়য়া কৃতঃ। বিমোহিতধিয়াং দৃষ্টস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥ ৭।৫।১১॥"-শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"পর ইতি পুংসাং ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদিত্যাদিরীত্যানাদিত এব ভগবদ্‌বিমুখানাং জীবানাং অতএব নূনং সের্ষ্যয়া যস্য ভগবতো মায়য়া মোহিতধিয়াং স্বরূপবিস্মরণপূর্ব্বকদেহাত্মবুদ্ধ্যা বিশেষেণ মোহিতবুদ্ধীনাং অসতাং যন্মায়ৈব পরঃ পরকীয়োঽর্থঃ।" এই টীকা হইতে জানা যায়, মায়া যেন আমাদিগকে "ঈর্ষ্যার সহিতই" অঙ্গীকার করিয়া আমাদের স্বরূপের বিস্মৃতি জন্মাইয়া দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া দিলেন। "ঈর্ষ্যার সহিত" বাক্যের ব্যঞ্জনা বোধ হয় এই যে—"যেখানে সুখের উৎস, সেখানে সুখ না খুঁজিয়া তুমি আসিয়াছ—আমার এই নশ্বর ব্রহ্মাণ্ডে সুখ খুঁজিতে—যেখানে সুখ বলিয়া কোনও জিনিসই নাই, যাহা আছে, তাহাও অনিত্য, জড়, দুঃখসঙ্কুল; সেখানে তুমি সুখের অনুসন্ধানে আসিয়াছ! আচ্ছা, থাক; এখানকার সুখের মজা বুঝ।" এইরূপ মনে মনে ভাবিয়াই

যেন মায়াদেবী তাঁহার আবরণিকা বৃত্তিদ্বারা বহির্ম্মুখ জীবের স্বরূপের জ্ঞানকে সম্যক্‌রূপে আবৃত করিয়া দিলেন এবং বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বারা তাহার চিত্তকে মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে এবং তাহার দেহেন্দ্রিয়াদিতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিলেন—যেন জীব অন্য সমস্ত ভুলিয়া এই প্রাকৃত জগতের সুখভোগে তন্ময় হইয়া থাকিতে পারে। এইরূপে মায়া-কর্ত্তৃক অঙ্গীকৃত হইয়া সৃষ্টিসময়ে জীব একটী মায়িক দেহ পাইল—নিজের অভীষ্ট সুখভোগের উপযোগী দেহ। (জীব স্বীয় কর্ম্মফল অনুসারেই সেই কর্ম্মফল ভোগের উপযোগী দেহ পাইয়া থাকে। শাস্ত্রকারগণ কর্ম্মকেও অনাদি বলিয়াছেন; এই অনাদি কর্ম্মফল ভোগের উপযোগী দেহই জীব অনাদিকালে পাইয়াছে। সেই কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে আবার নূতন নূতন কর্ম্ম করিয়া পরবর্ত্তীকালে নূতন নূতন ভোগায়তন দেহ পাইয়া থাকে)। সেই দেহেই জীব প্রবেশ করিল। তাহার স্বরূপের জ্ঞান নাই বলিয়া মনে করিল—এই দেহই আমি; ইহাই দেহাত্মবুদ্ধি। দেহের ইন্দ্রিয়াদিকে মনে করিল—এসকল ইন্দ্রিয় আমারই; তাই ইন্দ্রিয়ের সুখকে নিজের সুখ মনে করিয়া প্রাকৃত জগতে ভোগ্য বস্তু খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রাণ হয়। আমাদের এই হয়রাণী এখনও শেষ হয় নাই। ইহাই প্রাকৃত জগতের সুখের "মজা"।

প্রশ্ন হইতে পারে, কেন আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিলাম? কেন আমরা অনাদিকাল হইতে বহির্ম্মুখ? হয়তো আমাদের অণুস্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারেই আমরা অনাদিবহির্ম্মুখ, অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণস্মৃতিহীন।

আরও প্রশ্ন হইতে পারে—জীব হইল চিদ্রূপা শক্তি। চিদ্-বিরোধী মায়াশক্তি কিরূপে তাহাকে মোহিত করিয়া তাহার স্বরূপের জ্ঞানকে আবৃত করিতে পারে। জীবের স্বরূপানুবন্ধি জ্ঞানকে অজ্ঞানরূপা মায়া কিরূপে আচ্ছন্ন করিতে পারে? ইহার উত্তর—শ্রীজীবগোস্বামী দিয়াছেন। তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।"—ইত্যাদি (বি, পু, ৬।৭।৬১) শ্লোকের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন—"যদ্যপীয়ং বহিরঙ্গা, তথাপ্যস্যাস্তটস্থশক্তিময়মপি জীবমাবরয়িতুং সামর্থ্যমস্তীতি।—বহিরঙ্গা হইলেও এই মায়ার তটস্থা শক্তিময় জীবকে আবরণ করিবার সামর্থ্য আছে।" উপরে উদ্ধৃত "স যদজয়াত্বজামনুশয়ীত" ইত্যাদি শ্রীভা ১০।৮৭।৩৮-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—প্রশ্ন হইতে পারে যে, চিদংশে জীবে ও ব্রহ্মে বা শ্রীকৃষ্ণে ভেদ যখন নাই, তখন মায়াশক্তি কেন জীবকে কবলিত করিতে পারে, কিন্তু কেন শ্রীকৃষ্ণকে কবলিত করিতে পারেনা? উত্তর এই—জীব চিৎ-কণ (অতি ক্ষুদ্র) বলিয়াই মায়া তাহাকে কবলিত করিতে পারে; শ্রীকৃষ্ণ চিন্মহাপুঞ্জ বলিয়া তাঁহাকে কবলিত করিতে পারেনা—অন্ধকার যেমন তামা, পিতল, সোনা প্রভৃতির তেজকেই আবৃত করিতে পারে; কিন্তু সূর্য্যের তেজকে আবৃত করিতে পারেনা, তদ্রূপ। "নন্থু চিদ্রূপাবিশেষা-দহমপি কথমবিদ্যয়া আলিঙ্গিতো ন ভবেয়মিতি চেৎ মৈবং জীবঃ খলু চিৎ-কণঃ, ত্বন্তু চিন্মহাপুঞ্জঃ। তাম্রপিত্তল-স্বর্ণাদিতেজ এব তমসা আবৃতং ভবেন্নতু সূর্য্যতেজ ইত্যাহুঃ।"

শ্রীজীব বলিয়াছেন, মায়া বহিরঙ্গা শক্তি হইলেও তটস্থাশক্তিময় জীবকে আবরণ করিবার সামর্থ্য তাহার আছে। চক্রবর্ত্তী বলেন, জীব চিৎ-কণ বলিয়াই মায়া তাহাকে কবলিত করিতে পারে। তাহা হইলে বুঝা গেল, তটস্থাশক্তিময় জীবের চিৎ-কণত্বই তাহার মায়া কর্ত্তৃক কবলিত হওয়ার হেতু এবং সেই জীব চিৎ-কণ বলিয়াই মায়ারও তাহাকে আবৃত করার সামর্থ্য। শ্রীজীবের উক্তির (তটস্থাশক্তিময় জীবকে আবৃত করিবার সামর্থ্য, এই উক্তির) ব্যঞ্জনা এই যে, জীব চিদ্রূপা তটস্থাশক্তি বলিয়াই মায়া তাহাকে কবলিত করিতে সমর্থ। এই সঙ্গে চক্রবর্ত্তীর উক্তি যোগ করিলে তাৎপর্য্য যাহা পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে এই—জীব চিদ্রূপা তটস্থাশক্তির কণারূপ অংশ বলিয়াই মায়া তাহাকে কবলিত করিতে পারে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যাহারা নিত্যমুক্তজীব, তাহারাও তটস্থাশক্তিময় এবং তাহারাও চিৎ-কণ। তটস্থাশক্তিময় বলিয়াই যদি জীবকে কবলিত করিতে মায়া সমর্থা হয় (শ্রীজীব যেমন বলেন) এবং চিৎ-কণ বলিয়াই যদি জীবকে মায়া আবৃত করার সামর্থ্য ধারণ করে (চক্রবর্ত্তী যেমন বলেন), তাহা হইলে মায়া নিত্যমুক্ত জীবকে কবলিত বা আবৃত করিতে সমর্থ হয়না কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে—নিত্যমুক্ত জীবে এমন কিছু বিশেষ বস্তু আছে কিনা, যাহা অনাদিবহির্ম্মুখ জীবে নাই। শ্রীজীব বলেন—আছে। নিত্যমুক্ত জীব স্বরূপশক্তিদ্বারা অনুগৃহীত। অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবে স্বরূপ-শক্তির এই অনুগ্রহের অভাব। এই পার্থক্যই মায়ার সামর্থ্য-প্রকাশের পার্থক্যের হেতু। নিত্যমুক্ত এবং অনাদি-বহির্ম্মুখ—উভয় প্রকার জীবই চিদ্রূপ-তটস্থাশক্তির চিৎ-কণ অংশ; নিত্যমুক্ত জীবে স্বরূপশক্তির অনুগ্রহ আছে বলিয়া (স্বরূপশক্তির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত বলিয়া) মায়া তাহাকে স্পর্শ করিতে পারেনা; কিন্তু অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবে স্বরূপশক্তির অনুগ্রহ নাই বলিয়া মায়া তাহাকে কবলিত করিতে পারে। "অপরস্তু তৎপরাঙ্মুখত্বদোষেণ লব্ধচ্ছিদ্রয়া মায়য়া পরিভূতঃ সংসারী ।৪৫॥"—এই পরমাত্মসন্দর্ভবাক্যে শ্রীজীব তাহাই প্রকাশ করিলেন।

মায়ার জীব-মোহন-সামর্থ্যের কথা বলিতে গিয়া শ্রীজীব যে জীবকে "তটস্থশক্তিময়" বলিয়াছেন, তাহার ব্যঞ্জনাও হইতেছে এই যে, জীবে কেবল তটস্থা শক্তিই আছে, (প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্), স্বরূপশক্তি নাই।

মায়া যে শ্রীকৃষ্ণকে বা শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ কোনও ভগবৎ-স্বরূপকে মোহিত করিতে পারে না, এমন কি তাঁহাদের নিকটেও যাইতে পারে না, তাহার কারণও স্বরূপ-শক্তি। শ্রীকৃষ্ণে বা ভগবৎ-স্বরূপে স্বরূপশক্তি আছে বলিয়াই মায়াকে দূরে অবস্থান করিতে হয়। শ্রীমদ্‌ভাগবতের বহু স্থানে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রারম্ভ-শ্লোকেই দেখা যায়—"ধাম্না স্বেন নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।" এস্থলে "ধাম্না"-শব্দের অর্থ চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"স্বরূপ-শক্ত্যা।" এই অর্থে "ধাম্না স্বেন নিরস্তকুহকম্"-বাক্যের তাৎপর্য্য হইবে এই যে—সত্যস্বরূপ ভগবান্ স্বীয় স্বরূপশক্তির প্রভাবেই কূহককে (মায়াকে) নিরস্ত (দূরে অপসারিত) করিয়াছেন। আবার দশম স্কন্ধের ৩৭শ অধ্যায়ের ২২শ শ্লোকেও নারদ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়াগুণপ্রবাহম্।" এস্থলে "স্বতেজসা"-শব্দের অর্থ শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"চিচ্ছক্ত্যা" এবং শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—"স্বরূপশক্তিপ্রভাবেন।" তাহা হইলে উল্লিখিত "স্বতেজসা"-ইত্যাদি বাক্যের মর্ম্ম হইতেছে এই যে—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির প্রভাবে মায়ার গুণপ্রবাহ তাঁহা হইতে নিত্যই নিবৃত্ত হইতেছে। বিশেষতঃ "ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥ শ্রীভা, ১।৭।২৩॥"—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের এই উক্তি হইতেও জানা যায়, স্বরূপশক্তির প্রভাবেই মায়া শ্রীকৃষ্ণ হইতে দূরে অবস্থান করে। মায়া যে ভগবান্‌কে আক্রমণ করিয়াছিল এবং আক্রমণ করার পরেই যে ভগবান্ স্বীয় স্বরূপ-শক্তির প্রভাবে মায়াকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, তাহা নহে। আক্রমণ করা তো দূরে, "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।"-ইত্যাদি (শ্রীভা, ২।৫।১৩) শ্লোক-প্রমাণবলে জানা যায়, মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে আসিতেই লজ্জিত হয়। তাই দূরে দূরে, ভগবানের লীলাস্থলাদির বাহিরেই অবস্থান করে। মায়ার এই লজ্জা, এইরূপে দূরে দূরে অবস্থানের কারণই হইল স্বরূপশক্তির প্রভাব। ভগবানে স্বরূপশক্তি আছে বলিয়াই মায়া তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইতে পারে না, স্বরূপশক্তির অস্তিত্বই মায়াকে দূরে থাকিতে বাধ্য করে, ইহাই "ধাম্না স্বেন নিরস্তকুহকম্"-বাক্যের তাৎপর্য্য।

স্বরূপে বিভু ভগবান্‌কে শক্তিতে বা প্রভাবেও বিভু করিয়াছে এই স্বরূপশক্তিই। স্বরূপে অণু নিত্যমুক্ত জীবকেও প্রভাবে বৃহৎ করিয়াছে এই স্বরূপশক্তি। যেহেতু, স্বরূপশক্তি (বা পরাশক্তি) নিজেই বিভু। "পরাস্য শক্তিরিত্যাদৌ স্বাভাবিকীতি পরমাত্মাভেদাভিধানাৎ পরা বিভ্বী সৈব হীতি॥—কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ॥ ৩।৩।৪০॥-বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্য॥" কিন্তু স্বরূপে অণু অনাদিবহির্ম্মুখ জীব স্বরূপশক্তির কৃপা পায় নাই বলিয়া প্রভাবেও অণু রহিয়া গিয়াছে—অনাদি বহির্ম্মুখ জীব স্বরূপেও অণু, প্রভাবেও অণু; তাই মায়া তাহাকে কবলিত করিতে সমর্থ। সম্ভবতঃ, স্বরূপশক্তির অভাবজনিত এই প্রভাবের অণুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—জীব চিৎকণ বলিয়াই মায়া তাহাকে কবলিত করিয়াছে।

সার কথা এই যে, অনাদিকাল হইতেই আমরা স্বরূপশক্তির কৃপা হইতে বঞ্চিত বলিয়া আমরা অনাদিকাল হইতেই কৃষ্ণবহির্ম্মুখ এবং এই বহির্ম্মুখতাবশতঃই আমরা অনাদিকাল হইতেই মায়াবদ্ধ।

আরও গোড়ার কথা অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায়, অনাদিকাল হইতেই আমরা ভগবান্‌কে ভুলিয়া আছি, কখনও তাঁহার কথা, তাঁহার অস্তিত্বের কথা, তাঁহার আনন্দস্বরূপত্বের বা সুখস্বরূপত্বের কথা আমাদের মনে জাগে নাই। আমাদের এই ভগবৎ-বিস্মৃতি অনাদিসিদ্ধ অথবা অনাদি-কর্ম্মের ফল। অথচ আনন্দস্বরূপের সহিত আমাদের নিত্য অচ্ছেদ্য সম্বন্ধবশতঃ আমাদের মধ্যে একটা স্বাভাবিকী চিরন্তনী সুখবাসনা আছে। এই সুখ-বাসনা যে চরমা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে একমাত্র সেই আনন্দস্বরূপে বা রসস্বরূপ ভগবানে, তাঁহাকে ভুলিয়া আছি বলিয়া আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সুখসম্ভার সাজাইয়া রাখিয়াছেন (সৃষ্টিপ্রবাহও অনাদি), সেই দিকেই আমাদের দৃষ্টি গেল এবং সেই সুখসম্ভারই আমাদের চিরন্তনী সুখবাসনার চরমা তৃপ্তি সাধন করিতে পারিবে বলিয়া আমাদের ভ্রান্ত ধারণা জন্মিল; তাই আমরা যেন সেই দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। ইহাই আমাদের অনাদিবহির্ম্মুখতা—যাহার মূল হইল অনাদি-ভগবৎ-বিস্মৃতি। ভগবান্‌কে ভুলিয়া ছিলাম বলিয়া তাঁহার স্বরূপশক্তির কৃপা হইতেও বঞ্চিত হইয়াছি। কারণ, স্বরূপশক্তি সর্ব্বদা ভগবানের স্বরূপেই অবস্থিত বলিয়া, ভগবদুন্মুখ জীবের প্রতিই তাঁহার কৃপা হইতে পারে।

মায়াবন্ধন ঘুচাইবার উপায়। আমাদের এই মায়াবন্ধন স্বরূপানুবন্ধি নয়, আগন্তুক; সুতরাং ইহা দূরীভূত হওয়ার যোগ্য—শুভ্র বস্ত্রের আগন্তুক মলিনতা যেমন দূরীভূত হওয়ার যোগ্য, তদ্রূপ।

কিন্তু কিরূপে মায়াবন্ধন দূরীভূত হইতে পারে? মায়াবন্ধনের হেতু যাহা, তাহা দূরীভূত হইলেই এই বন্ধন ঘুচিতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মায়াবন্ধনের হেতু হইতেছে ভগবদ্-বহির্ম্মুখতা, বা তাহারও হেতু—ভগবদ্-বিস্মৃতি। এই বিস্মৃতিকে দূর করিতে পারিলেই ভগবদ্-বহির্ম্মুখতা এবং তজ্জনিত মায়াবন্ধনও ঘুচিতে পারে।

কিন্তু বিস্মৃতিকে কিরূপে দূর করা যায়? বিস্মৃতি হইল স্মৃতির অভাব—অন্ধকার যেমন আলোর অভাব, তদ্রূপ। বিস্মৃতিকে দূর করিতে হইবে স্মৃতিদ্বারা—অন্ধকারকে যেমন দূর করা যায় আলো দ্বারা। তাই বলা হইয়াছে—"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥ পাদ্মোত্তরখণ্ড॥ ৭২।১০০॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ॥ ১।২।৫॥—সর্ব্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে; কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না। যত বিধি ও নিষেধ আছে, সমস্তই এই দুই বিধি-নিষেধের কিঙ্কর।"

কিন্তু চেষ্টা করিয়াও তো আমরা ভগবৎ-স্মৃতি হৃদয়ে স্থায়ী করিতে পারি না। ভগবৎ-স্মরণে মনঃসংযোগ করিতে চাহিলেও মন কেবল ছুটিয়া ছুটিয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়েতে যাইয়া উপস্থিত হয়। কখন যে ছুটিয়া যায়, তাহাও যেন টের পাওয়া যায় না। ইহার হেতু কি?

ইহার হেতু এই যে, মায়া আমাদের মনকে বিক্ষিপ্ত করিয়াছে; বিষয় হইতে মনকে টানিয়া আনিতে চাহিলেও আমরা পারি না। কারণ, মায়া ঈশ্বরের শক্তি; মহাপরাক্রমশালিনী; আর আমরা ক্ষুদ্রশক্তি জীব। মায়ার সঙ্গে আমরা পারিয়া উঠি না। তাহা হইলে উপায়? উপায় স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে বলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার শরণাপন্ন হইলেই মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, ইহার আর অন্য উপায় নাই। "দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ গীতা॥" সর্ব্বশেষেও অর্জ্জুনকে তিনি বলিয়াছেন—"দেহের সুখমূলক বা দুঃখনিবৃত্তিমূলক যত রকম ধর্ম্ম আছে, তৎসমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

কিন্তু কেবল মুখের কথাতেই শরণাপত্তি হয় না; তজ্জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে হইবে। মনকে প্রস্তুত করার জন্য সাধনের প্রয়োজন। সাধনের ফলে ভগবৎ-কৃপায় মায়ামুক্ত হইয়া জীব স্বরূপে স্থিত হইয়া পার্ষদরূপে ভগবৎ-সেবা পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারে।